মম-অন্তর

মম-অন্তর

অমরপ্রীত ব্রহ্মচারী

শরৎ পাবলিশিং হাউস
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা - ৭০০০০৯

প্রকাশিকা ঃ
ছায়া চ্যাটার্জ্জী

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ মহালয়া—৬ই অক্টোবর ১৯৬৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭-এ, কারবালা ট্যাংক লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
খালেদ চৌধুরী

কাঁচের জানলার পাল্লাটা খুলতেই এক ঝলক হাড়-কনকনে পাহাড়ী বাতাস ছুঁয়ে গেছে সুরশ্রুতির সর্বাঙ্গ।

ভেতরে-বাইরে কোনো কাঁপুনি আসেনি। বরং ভালোই লেগেছে। ঘরের বাতাসের গুমোট ভাবটা কেটে গেছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—যত দূর চোখ যায়, অত দূর।

অন্ধকার অন্ধকার!

কি ভয়ঙ্কর। মিশমিশে কালো ঘন জমাট। সবকিছু পেটে পুরে বসে আছে। সর্বগ্রাসী খিদে। পাহাড় জঙ্গল এমনকি এই তিনতলা প্রাসাদপুরীটা পর্যন্ত। সুরশ্রুতিরও অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে বুঝি এখ্‌খুনি। এ অন্ধকার পাহাড় কখনো টলবে না, নড়বে না। না-না, ধারণাটা ভুল। পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, গলছে। ঢেউ উঠছে। কি বিশাল ঢেউ! কি উথাল-পাতাল ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কে যেন ডুবছে উঠছে, উঠছে ডুবছে। বাতাস বেয়ে সাঁতার কেটে কেটে এইদিকে এগিয়ে আসছে।

কে? ভজন সিং কি?

না-না।

তবে কে?

রাতের এই শেষ প্রহরটা কি সুরশ্রুতির জীবন থেকে কাটবে না?

ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠছে অসহ্য যন্ত্রণায়। পাঁজরার হাড় কটা বুঝি ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে যাবে। বোবা কান্না ডুকরে উঠছে ভেতরে। নিজেকে সামলাতে পারছে না। নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না সুরশ্রুতি। গলার স্বরে বেরিয়ে আসছে বুকফাটা করুণ কান্না।

কান্না-কান্না-কান্না—।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

অন্ধকার থেকে ভেসে উঠেছে প্রাসাদপুরী। জেগে উঠেছে। আলোয় আলো। জানলার কাছ থেকে টলতে টলতে দু'হাতে বুক চেপে ধরে বিছানায় আছড়ে

পড়েছে।

পাশের খাটে শুয়েছিল মা বর্ণনালা। ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছে। মেয়ের কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখে, বেঁহুশ।

বর্ণমালা মেয়ের ব্যথা-বেদনা সমস্ত জানে। এই কান্নার কারণও অজানা নয়। কিন্তু কাউকে বলার উপায় নেই, জানানোর উপায় নেই।

উৎকর্ণ হয়ে শুনছে বর্ণমালা। দরজার বাইরে পায়ের শব্দ এসে থমকে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ছে। একটা আধটা নয়। অনেক, অনেক। একতলা উঠে এসেছে দোতলায়, তিনতলাও নেমে এসেছে।

মেয়ের কাছে বসে থাকতে পারেনি বর্ণমালা। খুব বিব্রত বোধ করেছে। রাজ্যের লজ্জা এসে পেয়ে বসেছে।

কি বলবে কাকে? যারা এসে উপস্থিত, ওদের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? কোনো উত্তরই মাথায় আসছে না। বাইরের গুঞ্জন বেশ কানে আসছে। আর বসে বসে ভাববার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে উঠে পড়েছে। পায়ে পায়ে এসে, দরজা খুলে মুখ বাড়াতেই—এক রাশ চোখের দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কালো নীল খয়েরি তারার মৌন প্রশ্ন। কৌতূহল অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা কারণ—দেশি-বিদেশি ছোট-বড় সব বয়েসী অতিথিদের।

বর্ণমালা মাথা নিচু ক'রে নম্রগলায় বলেছে। —ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোয় দুঃখিত। ক্ষমাপ্রার্থী। এটা স্রেফ রাতের দুঃস্বপ্ন।

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বসেছে। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলোচ্ছে।

বেচারা!

চব্বিশটা বসন্ত বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। কিন্তু একটাতেও বসন্তের ফুল ফোটেনি, ফল ফলেনি।

শুধু হতাশার মরুভূমি।

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নির্যাতন-অপযশ-অপবাদ—কি না ঘটেছে! কলঙ্কের কালিতে তো আপাদমস্তক মাখামাখি।

কেউ ধুইয়ে দিতে আসেনি, কেউ সান্ত্বনা দিতে আসেনি। কেউ টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেনি। চারদিক থেকে শুধু বিদ্রূপ আর ঘেন্না। ঘেন্না আর বিদ্রূপ।

মেয়েকে শান্তি দেবার জন্যে বর্ণমালার কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়নি। অন্তত জ্ঞাতসারে নয়ই। দেবতার মন্দিরে মন্দিরে ধন্না দিয়েছে। কিছু পরিবর্তন হয়নি। দেশে দেশে ঘুরেছে। সাধু-সন্তের দ্বারস্থ হয়েছে। ফল ফলেনি। বিশ্বাসের ভিত ভেঙে

চুরমার। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়েছে কিন্তু তাতেও কিছু না। হয়ত নিজের ওপরেও বিশ্বাস রাখতে পারেনি। বিশ্বাস ভেঙে গেছে বারে বারে। তাই মেয়ের অশান্তির কোনো উপশমের লক্ষণ দেখতে পায়নি।

শূন্যের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছে। শোনবার কেউ নেই বলে। যদি কেউ থাকো সত্যি সত্যি—আমার সৌভাগ্য যদি কিছু থেকে থাকে; সুরকে দিয়ে দাও। তার বদলে ওর দুর্ভাগ্য দাও আমাকে। তাতেও আশার আলো দেখেনি বর্ণমালা। হয়ত বর্ণমালার সৌভাগ্য ছিল না কিছুই। দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল। সেই দুর্ভাগ্য মেয়ের ভাগ্যে বর্তেছে। এটা কম আপসোসের কথা নয়।

মা-মেয়ের এই মরণ-গহ্বরের যন্ত্রণা থেকে কে মুক্ত করতে আসবে তাদের! কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছে না।

দু' চোখের জল ঝরে পড়েছে। বুক ভিজে যাচ্ছে। থামাতে পারছে না এই কান্নার বন্যাকে।

পরের দিন।

সাতসকালে এসে হাজির পাশের ঘরের প্রতিবেশীরা।

দরজায় মৃদু টোকা।

দরজা খুলতেই বর্ণমালার মুখে হাসির ঢল নেমেছে। দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা ক'রে ভেতরে নিয়ে এসেছে ওদের। চেয়ারে বসিয়ে সুসমাচার জিজ্ঞেস করেছে। ওরাও হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছে।

প্রথমে বলেছে বৈভব সিং।—কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না ক'রে, যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন আমাদের ডাকবেন।

বৈভব সিং বছর চব্বিশের রাজপুত যুবক। আলোয়ারের রাজাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শিকারপ্রিয় রাজাদের এক সময় এই প্রাসাদপুরী বিশ্রামনিবাস ছিল। এখন নানা দেশের অতিথিদের আগমন। শিকারের সে জঙ্গল আজও আছে। আজও লোকে আসে দেখতে। বাঘ শিংবাহারী হরিণ নীলগাই—জন্তু-জানোয়ার।

প্রতি বছর আসে বৈভব সিং। এ বাড়ি সে ভুলতে পারেনি। এখানকার বন-জঙ্গ -লও।

পরিচয়টা সংক্ষেপ হ'লেও বৈভব সিংকে খুব ভালো লেগেছে বর্ণমালার। ভালো লেগেছে সুরশ্রুতিরও। ঘরে প্রবেশের পর থেকেই সুরশ্রুতি একবারের জন্যেও বৈভব সিংয়ের দিক থেকে চোখ ফেরায়নি।

কি এত দেখছে ওকে কে জানে! স্ত্রী সুমীরণবাঈয়ের একেবারেই অপছন্দ। অস্বস্তিকর। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ছটফট করেছে।

ওদের সঙ্গের সন্ন্যাসিনী উদাসীমা চনমন ক'রে তাকাচ্ছে এ-দিক ও-দিক। অস্থির চঞ্চল। রহস্য মাখানো দু'চোখ থেকেই যেন কত অজানা রহস্য উঁকি মারছে:

প্রমাদ গনছে, বর্ণমালা। ঘরটার পরিবেশ পরিস্থিতি অদ্ভুত হয়ে উঠেছে।

চেয়ার ছেড়ে ওরা তিনজনে উঠে পড়তে যাচ্ছে, ওঠা আর হলো না। বসে পড়েছে আবার। হলো না সুরশ্রুতির জন্যে।

প্রত্যেককে আরতি করতে শুরু করে দিয়েছে সুরশ্রুতি।

আরতির থালায় পরিপূর্ণ সাজানো রয়েছে—চাল, তিল, মিষ্টি, চন্দন, সিঁদুর, রোড়ী। মাঝখানে প্রদীপ জ্বলছে।

আরতির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকের মুখের ভাব প্ররিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। হয়ে গেল। স্বাভাবিক। হাসি-হাসি মুখ সবার, আনন্দে ভরপুর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে উদাসীমা। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছে সুরশ্রুতিকে। আদর করেছে চুমু খেয়ে দু'গালে।

খুশীতে ডগমগ সুমীরণবাঈ। ও হাসতে হাসতে সুরশ্রুতির চিবুকটা ধরে নেড়ে দিয়েছে।

বৈভব সিং-এর অমায়িক দৃষ্টি। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এসেছে। গলায় স্বরে খুশীর জোয়ার। উজান বয়ে গেছে ঘরময়। শুধু একটি শব্দ, তাও অস্ফুটে বেরিয়েছে মুখ দিয়ে।—সু-ক্রি-য়া—ধন্যবাদ।

জবাবে সুরশ্রুতি মৃদু হেসে মাথা নত করেছে।

অতিথি আপ্যায়নের সুরশ্রুতির এই আরতিটা সকলের চোখে স্বর্গের সুষমা ঝড়ে পড়েছে যেন মর্তের মাটিতে। এ যেন মহাকবির স্বপ্নে দেখা—

"আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর।"...

ঘরের সকলে বুঝ একটা অজানা সম্মোহনের বাঁধনে সম্মোহিত হয়ে গেছে। স্থান কাল পাত্র ভুলে গেছে। কেউ কারোর পর নয়। একে অন্যের আপনজন। আত্মার আত্মীয়।

পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে অমাবস্যার অন্ধকার আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আলো।

একটা ভাবে বিভোর হয়ে থাকা, ডুবে থাকা বেশিক্ষণ সয় না তাই। কারণ—একটা শেষ হবার আগেই আরেকটা দাঁড়িয়ে থাকে এগোনোর জন্যে। কোনো ব্যতিক্রম মানতে রাজী নয় সে।

এখানেও তাই ঘটেছে। এতটুকু দেরী হয়নি। দেরী হয়নি শান্তি আনন্দ নিঃশেষ করে দিতে।

বাইরে থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই, ভেজানো দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে ভেতরে বীরগুণ সিং। বৈভব সিং-এর খুড়তুতো ভাই। চঞ্চল দুরন্ত। ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। একেবারে সুরশ্রুতির গা ঘেঁষে বসে পড়েছে। আবার ঘরের গুমোট অবস্থা। উঠে পড়েছে সুরশ্রুতি। এরাও তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বৈভব সুমীরণবাঈ আর উদাসীমা।

বীরগুণের দিকে ফিরে তাকায়নি সুরশ্রুতি। বর্ণমালাও। বিরক্তির একশেষ। এ যেন জোছনায় রাতে হঠাৎ একটা কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদের শোভা।

দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরশ্রুতি।

মনে মনে ছবি একে চলেছে ওদের—বৈভব সিং, সুমীরণবাঈ, উদাসীমা। সুন্দর, সুপুরুষ বৈভব সিং। পরনে চুড়িদার-পাজামা। চাঁপা রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি। ডান হাতে হিরের আংটি।

সুমীরণ বাঈয়ের আগেকার রাজস্থানী সাজ। লাল ঘাগরা-চোলিতে সোনালী ফুল আর সবুজ ওড়নায় সোনালী চুমকি। দু'হাতে ভর্তি হাতির দাঁতের চুড়ি। দশ আঙুলে পান্না-হিরে, মণি-মুক্তো, নানা পাথরের জ্বলজ্বলে আংটি। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ।

উদাসীমায়ের রুখু এলো চুল, হাত অবধি আদ্দির ফিনফিনে জামা। আদ্দির থান হাল্কা লটকানের রঙে ছোপানো। দেখতে ভালো লাগে—মনে রাখার মতন।

ফিরে তাকাতেই দেখে, বীরগুণ সিংয়ের দু'টো চোখ। হিংস্র পশু যেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে সুরশ্রুতির দিকে। ও চোখের খিদে বুঝতে বাকি নেই সুরশ্রুতির। পাশের ঘরে চলে গেছে তাড়াতাড়ি।

বর্ণমালা জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বীরগুণ সিং-কে বিদায় দিতে চেয়েছে। সুরশ্রুতির শরীর মন ভালো নয়। আজকের মতো তারা একটু বিশ্রাম নিতে চায়।

বীরগুণ সিং ছাড়বার পাত্র নয়। যা বলার সে আজ বলে যাবেই। ক'দিন ধরে বলব বলব করে সুযোগ পাচ্ছে না। আজ পেয়ে গেছে যখন, বলেই ফেলবে।

সত্যি কথা বলতে লাজ-লজ্জা রাখা উচিত নয়। সে তো কোনো সৃষ্টিছাড়া আচরণ করছে না আর অন্যায়ও বলছে না। তার ভালো লেগেছে সুরশ্রুতিকে দেখে, পাশের ঘর থেকে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রতিবারেই। রাজপুতদের

দু'টো বিয়েতে কোনো আপত্তি নেই। সে বিয়ে করতে চায় সুরশ্রুতিকে।

মনের কথা সব খুলে জানিয়েছে বর্ণমালাকে।

বর্ণমালা শুনে হতভম্ব, হতবাক। মুখে বলতে পারেনি কিছু। মনে মনে বলেছে, আপদ এসে জুটল কোত্থেকে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে।—এসব কথা ভাববার এখন সময় নেই আমাদের। যেতে পারেন।

মুখ গোমড়া করে, ঘুষি পাকিয়ে দু'হাত দোলাতে দোলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে দুম দুম করে পা ফেলে বীরগুণ সিং। কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘরখানা। রাগে কি ফোঁসফোঁসানি! ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। সাপের গর্জন!

বেরবার সঙ্গে সঙ্গে, মুখের ওপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে বর্ণমালা।

বৈভব সিং আর সুরশ্রুতি—দুপরিবারই কদিনের আলাপ পরিচয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দু ঘরেরই আসা-যাওয়া চলছে। সকাল সন্ধে। গল্প-গুজব গান-বাজনা হাসি-মশকরা। বেশ আনন্দেই কাটছে দিন। তবে আনন্দের মাঝে মাঝে, উপদ্রব যে এসে উপস্থিত হচ্ছে না—তাও নয়। হচ্ছে। সাক্ষাৎ অশান্তির প্রতিমূর্তি—বীরগুণ সিং।

ভালো ভাবেই ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে সবাই। তবুও বেহায়া বেশরমের এতটুকু যদি মান-সম্মানের জ্ঞান থাকে। ছি ছি ছি। গণ্ডারের চামড়া যাকে বলে।

নির্লজ্জের মতন ঘরে ঢুকেই—কেউ কথা বলুক না বলুক শুনুক না শুনুক, নিজেকে নিয়েই পাঁচ-কাহন ক'রে দিল। অমুক করেছি তমুক করেছি, হাতি মেরেছি গণ্ডার মেরেছি। ত্রিভুবনে ওর মতন বীরপুরুষ আর কেউ নেই। জঘন্য!

ওকে দেখলেই তো সুরশ্রুতির মাথা ধরতে আরম্ভ হয়ে যায়। 'মাথা গেল মাথা গেল' করে ওখান থেকে ছুটে পালায়। খাটে গিয়ে চোখ বুজে প'ড়ে থাকে। অশান্তি অস্বস্তি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সবাই। সুরশ্রুতির মাথা ধরা সেরে যায় অমনি। হাসি মুখে এঘরে এসে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দেয় সকলের সঙ্গে।

মেয়েকে এইরকম প্রাণখোলা হাসতে বহুদিন দেখেনি বর্ণমালা। বর্ণমালা খুশী।

তবে উদাসীমাকে নিয়ে মনে একটা খটকা লাগছে বারবার। উদাসীমায়ের চাউনি দিনকে দিন কেমন যেন হয়ে উঠছে। একদৃষ্টে অমন ভাবে তাকায় মেয়েটার দিকে, সারা শরীর ফালা ফালা করে দেখছে বুঝি! আশ্চর্য! এত দেখার আর আছে কি?

সন্দেহের দোলা দুলতে থাকে বর্ণমালার মনে। বিশেষ ক'রে সুমীরণবাঈয়ের কথা শুনে।

সুমীরণবাঈ বলেছে, উদাসীমায়ের থেকে একটু সাবধান হয়ে থাকতে।

কেন?

উদাসীমা নাকি ছেলেমেয়েদের আপনজনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের করে রাখতে চায়। জলজ্যান্ত প্রমাণ তার স্বামী বৈভব সিং।

বৈভব সিং মাটির মানুষ। কোনো শখ-আহ্লাদ করতে জানে না। খেতে না দিলে খাবে না। খেতে চাইবেও না। কোনো অভিযোগও করবে না। এই সব দেখার দায়-দায়িত্ব সুমীরণবাঈয়ের। ঘরে থেকেও ঘরে নেই মানুষটা। কাছে থেকেও নেই কাছে। না আছে স্ত্রীয়ের ওপর টান, না আছে ছেলে দু'টোর ওপর। কেবল বাইরে বাইরে, তীর্থে তীর্থে ঘোরা। বছরের মধ্যে বাড়িতে আর থাকে ক'দিন? আটকাতে গেলে, না ব'লে-কয়েই পালিয়ে যাবে। এমন হয়েছে কতবার, বাড়ি থেকে লোক গিয়ে ধরে নিয়ে এনেছে। আর এই ব্যামোটা উদাসীমায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই বেশি হতে শুরু করেছে। বাড়াবাড়িটা সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। উদাসীমা যখনই ডাকবে যেখানে যেতে বলবে, তখনই তিনি তাঁর কথা শিরোধার্য করে চলবেন। কারো কথা শুনবেন না। বিষয়-আশয় সবকিছু রসাতলে গেলেও—না।

সুমীরণবাঈয়ের কোনো উপায় নেই। তাই স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার ছেলেপুলে ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। স্বামীকে আগলানোর জন্যে। পারল কই! পারছে কই! তবু জীবনমরণ চেষ্টা করে চলেছে। ক'রে যেতেও হবে তাকে। সব অনিশ্চিত জেনেও। এই সব শোনবার পর, কোন ছেলে-মেয়ের মা মন ঠিক রাখতে পারবে? উদাসীমা ঘরে ঢুকলেই, বর্ণমালার বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে।

উদাসীমা আদেশ করেছে।

প্রাসাদপুরীর পেছনে পাথরে বাঁধানো যে উঁচু চত্বরটা আছে, সেখানে নাচ-গানের আসর বসবে রাত ন'টায়—সকলকে যেতে হবে।

ইচ্ছে না থাকলেও যেতে বাধ্য। যাবে। চটানো চলবে না।

নতুন সাজে সেজেছে সারিস্‌কার গাছ-গাছালি। ফল ফুল নানা রঙের পাখির সম্ভার। আকাশে বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া। চতুর্দিকে পাহাড়ের পাঁচিল দেয়া। ছাই

খয়েরি—নানা বিচিত্র রঙের পাহাড় এদিক ওদিকে ছড়ানো। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। প্রাসাদপুরীর অতিথিনিবাসে দেশ-বিদেশের লোকের ভীড়ে ঠাসা জঙ্গলে বাঘ দেখার লোভে।

সবাই প্রাসাদপুরীর পেছনে পাথুরে চত্বরটার ওপর গোল হয়ে বসে আছে চেয়ারের ওপর। মধ্যিখানে তামার কি লোহার বোঝা যাচ্ছে না, লোহা-রঙে চারপায়া চারকোনা কানা-উঁচু কুণ্ডু। ওতে কাঠের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। আগুন পোয়াচ্ছে সকলে।

রাত ন'টা।

গান শুরু হলো।

যে-যার নিজের ভাষায় হাততালি দিয়ে দিয়ে নাচছে গাইছে। গানের তালে তালে অন্যেরাও গলা মিলিয়ে হাত ধরাধরি করে গাইছে নাচছে নাচছে গাইছে আগুনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে।

স্পেনের ছেলে মেয়ে দু'টি এবার ওদের ভাষায় গান গাইতে আরম্ভ করেছে। যে গানটা গাইছে ওরা, সে-গানটা সুরশ্রুতির ভালো রকম জানা। চেয়ারে বসে সুরশ্রুতি গুনগুন করে ওদের কথায় কথা মিলিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে গাইছে। হঠাৎ উদাসীমা সুরশ্রুতির কাছে এসে হাত ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলেছে। বলেছে, তুই যখন জানিস গা।

সুরশ্রুতি সুরেলা মিষ্টি গলায় গান ধরতেই, অন্যেরা চুপ ক'রে বসে পড়েছে। ওকেই জোর ক'রে বলেছে, তুমি একা গাও।

ধরাধরিতে গাইতে বাধ্য হয়েছে সুরশ্রুতি।

"পোরোকুরা আবলার লে তু
তুল্লা কোনেসে মেখোর কে ইয়ো
পোরোকুরা সে লেবের কেসিন পসিবলে বোলভের বোলভের..."

তুমি কথা দিয়েছিলে আসবে ব'লে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে চলেছি। কোনো খোঁজখবর পাচ্ছি না। আমার চোখের জল কোনো বাধাই মানছে না। কেঁদেই চলেছি আমি, শুধু কেঁদেই চলেছি। তোমার আসার আশায় বুক বেঁধে বসে আছি।

গান শেষে হাত তালির পর হাততালি। সাহেব-মেমসাহেবরা এসে সুরশ্রুতিকে জড়িয়ে ধরে দু'গালে চুমু খেয়েছে। চুমুর পর চুমু। আনন্দের ঝরনা বয়ে গেছে। একটা ইংরেজি গান গাইতে সব পক্ষ থেকে আবেদন এসেছে সুরশ্রুতির কাছে।

হাততালি দিয়ে দিয়ে নিজেরই লেখা ইংরেজি গানটা গাইছে সুরশ্রুতি।

যেন সবাই মিলে প্রার্থনা সংগীত শুনছে একমনে। নিজেদের অগোচরেই চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই।

খোলামেলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মানুষ যে গান শুনছে, ভুলে গেছে একদম। পরিবেশ পরিস্থিতি নিমেষে বদলে গেছে। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি গির্জার হলের ভেতরেই সকলে রয়েছে।

নতজানু হয়ে দু'চোখ বুজে প্রাণের আকৃতি দিয়ে প্রাণকে মনকে চেনা-জানার চেষ্টা করছে সুরশ্রুতি। নিশ্চয় যিশুর করুণায় সে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে তার মনকে। তার প্রাণকে। তার চেনার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই সকলে নিজেকে চিনতে পারবে। বুঝতে পারবে।

প্রাণের আবেগে, সুরে কথায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে সুরশ্রুতি। আত্মহারা হয়ে গেয়ে চলছে। সুমধুর কণ্ঠ, অমৃত বাণী।—

ও মাই মাইন্ড ও মাই মাইন্ড
হোয়াট্ আর্ট দাউ
নো দাই সেল্‌ফ নো দাই সেল্‌ফ,
ইউ আর মাইন্ড অফ্ পিস্
অল্ গুড্ থিঙ্কস্ দিস্,
অল্ ওভার
মাইন্ড অফ্ লাভ...

এরপর আর কোনো গানই জমে উঠবে না। কেউ আর কারোর কোনো গান শুনতে চাইছে না। সকলেরই সুরশ্রুতিকে নিয়ে মাতামাতি।

নওটংকিরা এসে বসে ছিল এতক্ষণ। বাপ মা ছেলে মেয়ে। ওরা গাইবে নাচবে। ওদের আসরের দিনক্ষণ পরে স্থির করা হবে।

আজকের সুরশ্রুতির গানের রেশটা যেন চিরদিনের মতন মনে প্রাণে অমর-স্মৃতি হয়ে থাকে—এইটাই সবার ইচ্ছে।

এ যেন একটা পরিষ্কার আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব।

বীরগুণ সিংকে নিয়ে দিন দিন অশান্তি বেড়েই চলেছে। যতই এড়িয়ে যাওয়া যাক না কেন, ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না বর্ণমালা আর সুরশ্রুতি। সময় সময়

'পালাই-পালাই' ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বেশি করে মা-মেয়ের। এই রকম মন উচাটন হলে টেকা দায় হবেই।

বৈভব সিংয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে, শত অশান্তির মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে বেশ ভুলে থাকা যায় অতীতের দুঃসহ যন্ত্রণায় বিভীষিকার দিন।

তা আর ভুলতে দিচ্ছে কই?

বেশ বুঝতে পারছে বর্ণমালা, বীরগুণ সিং দেবে না! সে পাত্রই নয় ও। নিজেরটা ছাড়া অন্যের কিছুই বুঝতে চায় না। বুঝবেও না।

মেয়ের তো দু'চক্ষের বিষ। শুনতে না চাইলেও ও শোনাবেই। দু'কানে হাত চাপা দিলেও।

তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে আমি রানী করে রাখব।

কাঁহাতক একঘেয়েমি কথা-ব্যবহার ভালো লাগে কার! তিতিবিরক্তি!

বর্ণমালা মনস্থ করেছে, বীরগুণ সিংয়ের স্ত্রী শমীকাবাঈয়ের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাবে। দেখা যাক, তাতে কোনো কিনারা হয় কিনা। ওর দুষ্টুমি নষ্টামি পাগলামির—ব্যাপারটা কি?

একটা গল্পের কথা মনে পড়েছে বর্ণমালার। মায়েদের মুখে শোনা।

এক মা তার প্রতিবেশীদের কাছে বলছে, ছেলে আমার পাগল। ভালো ক'রে জানে মা আর বৌ।

কথাটা ভাবতে গিয়েও নিজের মনেই হেসে ফেলেছে বর্ণমালা। অতি সত্যি বটে। মা-বৌ-ই তো জানতে পারবে সত্যিকারের পাগল কি না। বাইরের লোক বুঝবে কি ক'রে! শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি! কল না হলে তল্পি-তল্পা গোটাতেই হবে।

তবে বৈভব সিংদের সঙ্গে ঘা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে, ওরা ছাড়বে কি না সন্দেহ। আর ওদের ছেড়ে যেতেও আবার একটা ধাক্কা খাবে সুরশ্রুতি। মেয়েটার জন্যই যত দুশ্চিন্তা বর্ণমালার। সুরশ্রুতির মুখের হাসি ফুরিয়ে গেছল বহুদিন। সদাই বিষণ্ণ। ফোটা জুঁই ফুলের হাসি মেয়েটার মুখে ফুটে উঠছে আগেকার মতন।

বীরগুণ সিং সরে গেলেই নিশ্চিন্ত।

অনেক ভরসা নিয়ে বুকে সাহস বেঁধে শমীকাবাঈয়ের কাছে গেছে বর্ণমালা।

যতই হোক স্ত্রী স্বামীকে তো নিশ্চয় আটকাবে। কোনো স্ত্রীই চায় না, সে ছাড়া অন্য মেয়ে স্বামীর নজরে লাগুক। মুখে মুখে চলে আসছে একটা কথাই— মেয়েরা নাকি সতীনের হাতে স্বামীকে তুলে দেয়ার চেয়ে যমের হাতে তুলে দেয়াটা বেশি

পছন্দ করে।

বৈভব সিংয়ের পাশের ঘরটা বীরগুণ সিংয়ের।

লাল কার্পেটে মোড়া। সোফায় হেলান দিয়ে শমীকাবাঈ মীরাবাইয়ের ভজনের বই পড়ছে। ভারী গলায় মাঝে মাঝে সুর ভাঁজছে। কে ঘরে ঢুকেছে না ঢুকেছে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন একটা ধরন যেন মেওয়ারের মহারানী।

দেখেও না দেখার ভান করছে কি না কে জানে! বর্ণমালা দ্বিধাগ্রস্থ।

খানিকক্ষণ বসার পর একটা জোরে, নিঃশ্বাস পড়েছে বর্ণমালার।

শমীকাবাঈয়ের সারা শরীর কেঁপে উঠেছে। হাত থেকে বইটা খসে পড়েছে, কার্পেটের ওপর। আধশোয়া থেকে সামনের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছে।

গলায় কঠিন স্বর।

আদেশের সুরে শমীকাবাঈ বর্ণমালাকে প্রশ্ন করেছে, কিছু বলতে এসেছেন কি আপনি? সময় জেনে আসা উচিত ছিল। সব সমর সবায় সঙ্গে দেখা করি না আমি। সব সময় সবার সঙ্গে কথা বলি না আমি।

বর্ণমালা সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

জোড়হাতে বলেছে—ক্ষমা করবেন। কোন সময়ে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে একটু জানতে পারলে ভালো হয়।

ক্ষমা চাইতে একটু নরম হয়েছে শমীকাবাঈ। বাঘিনী মূর্তিটা বদলে গেছে। হাত নেড়ে বলেছে।—বসুন বসুন।

আমি নানান ভাবে থাকি। এক ভাব থেকে এক ভাবে আসতে গেলে, স্বাভাবিক হতে গেলে—একটু সময় লাগে আমার।

থাক! তবু ভালো। দেবী সুপ্রসন্ন বুঝি বর্ণমালার ওপর।

ভালো ফলের আশা নিয়ে, সমস্ত ঘটনার সবকিছুই আদ্যন্ত বলে গেছে এক নিঃশ্বাসে বর্ণমালা। কেন না শমীবাঈয়ের আবার কি ভাব এসে যায়। শমীকাবাঈ তো নিজের মুখেই বলে দিয়েছে।

শোনবার সময় শমীকাবাঈ বিজ্ঞ-সুবিচারকের মতন একমনে শুনে গেছে। কোনো বাধা দেয়নি। শুনতে কোনো আপত্তি করেনি। সন্তোষ-অসন্তোষ—কোনোটার চিহ্নই মুখে ফুটে ওঠেনি।

মনে মনে ভালো ফলের আশা পাওয়ার ক্ষণ গুনে চলেছে বর্ণমালা।

আচমকা 'হা-হা' ক'রে বুক কাঁপানো অট্টহাসি হেসে উঠেছে শমীকাবাঈ।

ধড়াস ধড়াস করে উঠেছে বর্ণমালার বুকের ভেতর।

কিছুক্ষণ বাদে।

হাসির রেশ চলে গেছে। শমীকাবাঈয়ের গলায় পুরুষের স্বর। ভাঙা ভাঙা ধরা ধরা।

বেশ খুশী-খুশী মনেই বলেছে, এতো বেশ ভালো কথা। বীরগুণ সিং বিয়ে করতে চেয়েছে যখন আপনার মেয়েকে, সে তো সুসংবাদ। ক'টা মেয়ের ভাগ্যে এমন হয়! বীরগুণ সিংয়ের মতন স্বামী পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যি। মানুষটার কোনো ছল-কপট নেই। এতো সরল যে, ওর মতন মানুষ দুনিয়ায়। আছে কিনা সন্দেহ। আমার কাছে লুকোনো ওর কিছু নেই। এ বিষয়টা আমি সবই জানি। বীরগুণই বলেছে সব।

বলতে বলতে শমীকাবাঈ একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়েছে।

আবার খনখনে আওয়াজে বলেছে। আমাদের রাজপুতদের মধ্যে পুরুষের অনেক স্ত্রী থাকে। স্বামীর অনেক স্ত্রী থাকা কম ভাগ্যের কথা নয়। স্ত্রীর পক্ষে কম মর্যাদার নয়। এতে আমাদের গৌরব। স্বামী পুরুষ মানুষ, বিয়ে করবেই।

কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে শমীকাবাঈ বর্ণমালার মুখখানা দেখে নিল। কি দেখল কি বুঝল তা সেই জানে।

আবার কথা শুরু।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছল। নিশ্চয় একথা সবার জানা। আমি বীরগুণকে আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি।—কারো কথা শুনো না। সুরশ্রুতিকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর। কারো বারণ করার অধিকার নেই। কথা মেনো না।

আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওর বিয়ে দিয়ে দেব। দেখি, কে এসে বাধা দেয়, আর কে আটকায়! কার ঘাড়ে কটা মাথা!

উত্তেজনায় শমীকাবাঈয়ের সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, হাঁপাচ্ছে। বলা থামিয়ে একটু দম নিচ্ছে।

হা-হতোস্মি!

বর্ণমালা কোথায় এসেছে! কার কাছে এসেছে! কি বলতে এসেছে! কি শুনছে! সীতার মতন মনে হচ্ছে।—বসুমতী তুমি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যাও। তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমি মরে বাঁচি। নোটোকে বোলো না নোটো, উল্টে ধরে চুলের মুঠো। এ যে তাই হলো শেষে। সুবিচারই বটে!

শমীকাবাঈ আবার মুখ খুলব খুলব করছে। গড়গড় ক'রে বলে যাওয়া ওর অভ্যেস। এক নিঃশ্বাসে বলে সব। তাই থেকে থেকে দম নিতে হচ্ছে। একে ভারী দেহ, তার ওপর মাথা থেকে পা অবধি গয়নায় মোড়া—রুপো সোনা জড়োয়ায়।

শমীকাবাঈ আবার বলতে শুরু করেছে।

বাক্যের স্রোত প্রবল গতিতে বয়ে চলেছে।

আমার ছেলে-পুলে নেই। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ। বেশ আনন্দেই আছি। আপন মনে নাচছি গাইছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি। ছেলে পেটে ধরলে রূপ নষ্ট মনের কষ্ট। পেটের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু নেই। বাইরের শত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। পেটের শত্রুকে না রাখা যায়, না তাড়ানো যায়। গুণ্ডা হবে কি চোর-ডাকাত হবে—বিষয়ের জন্যে কাকে খুন করবে কে জানে! এ সব ঝামেলা পোহাতে পারবে না শমীকাবাঈ। বাচ্চা! বেশ শান্তিতে আছি। বীরগুণকে বলে দিয়েছি।—তুমি বিয়ে-থা কর, তোমার ছেলে-মেয়ে-হোক। ওসবে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

একটু থেমে, আদেশের সুরে বর্ণমালার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে—শুনুন! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না। সব সময় ভালো সুযোগ আসে না। আসা মাত্র লুফে নিতে হয়। ধরে নিতে হয়। তবেই ভাগ্য ফেরে। তবেই মানুষ সুখী হয়। নচেৎ কিছু না কিছু না। আপনার মেয়ে আমার কাছে থাকবে। আমার সেবা করবে। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

বীরগুণ বলে, আমার মতন সুন্দরী দ্বিতীয়টি আর পড়েনি তার চোখে। নিশ্চয় আপনার মেয়ে আমার মতন সুন্দরী নয়! না দেখেই বলছি। অসম্ভব! ওকে বিয়ে করতে চাওয়াটা বুঝতে হবে বীরগুণের মহা দয়া।

বর্ণমালার শুনতে আর ভালো লাগছে না। সে নিজেকে অনেকক্ষণ সংযত ক'রে রেখেছে। অনেক কথাই মুখ দিয়ে 'বেরোই বেরোই' ক'রে আটকে গেছে। এবার তার উঠে পড়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে। এখানে আসাই ব্যর্থ।

উঠতে যাচ্ছে বর্ণমালা।

নজর পড়েছে শমীকাবাঈয়ের।

ইশারায় হাত নেড়ে বসতে বলেছে।

একটা গান শুনে যান। আমি নিজেই সুর দিয়েছি। মীরাবাঈয়ের ভজন।

কি বিভ্রাট! এমন গুণবতী স্ত্রী না হলে তার অমন গুণবান স্বামী হয়!

লোকে বলে বিধাতার মিলন করা, স্বামী-স্ত্রীর মূর্তি গড়া। যেমন দেবা তেনি দেবী। কি ফ্যাসাদেই পড়েছে!

নিজেদের পরিস্থিতি-পরিবেশের জন্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বর্ণমালা। কিন্তু বীরগুণ আর শমীকাবাঈকে দেখে, এদের আচার ব্যবহারে বিশ্বাস আসছে কিছুক্ষণের জন্যে। মিলাল বটে স্বামী-স্ত্রীকে। একেবারে রাজযোটক!

চিন্তায় ছেদ পড়েছে বর্ণমালার।

শাঁকচুন্নির গলা শোনেনি কোনোদিন—তবে কি এ তাদেরই গলা?

তাকিয়ে দেখে, শমীকাবাঈ উঠে দাঁড়িয়েছে।

টলতে টলতে আয়নার সামনে এসেছে। চোখের তারা এদিক ওদিক ঘুরছে, ভুরু নাচছে। ঘাড় এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে আসছে যাচ্ছে। পুরুষ-কণ্ঠ শমীকাবাঈয়ের গলায়। খনা খনা আওয়াজ। বেসুরো বেতালা।

কার্পেটের ওপর পা ঠুকে ঠুকে গাইছে শমীকাবাঈ।

পগ ঘুঁঙুরু বাঁধি মীরা নাচি রে
লোক কহে মীরা হো গয়ি বাউরি
শাস কহে কূলনাশীরে...

গজহস্তী পায়ের বেতাল আওয়াজে আর অমন সুন্দর গান বেসুরো ক'রে গাওয়ায় কানে তালা ধরবার জোগাড় বর্ণমালার। কান ঝালা-পালা, মন বলে পালা-পালা।

হাসি চাপতে পারছে না বর্ণমালা। শাড়ির আঁচলে মুখ মোছার ছুতোয় চাপবার চেষ্টা করছে। কি করে রেহাই পাওয়া যায় এর হাত থেকে! সেই অপেক্ষা।

শমীকাবাঈ যেই একটু থেমেছে, বর্ণমালা উঠে পড়ে জোড়হাত করে বলেছে, খুব ভালো খুব ভালো। বলেই ছুটে পালিয়ে গেছে। একদণ্ডও দাঁড়ায়নি।

বর্ণমালা শমীকাবাঈয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই চাপা হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে। প্রাণখোলা হাসি থামতে গলা ছেড়ে গান ধরেছে।—

কত রঙ্গ দেখালি মা তারা,
চোখে লাগে ধাঁধা মোর
হনু দিশেহারা।
হেথা হোথা ছুটে যাই।
কোনো হদিস না পাই
পাগলিনী করলি আমায়
পাগলপারা।

ঘরসুদ্ধু লোকের একসঙ্গে হাততালি।

বর্ণমালা ফিরে তাকিয়ে জিভ কেটে সোফার ওপর বসে পড়েছে ধপাস করে।

বৈভবরা রয়েছে খেয়ালই করেনি।

ওমা কি লজ্জা!

এই বর্ণ! আর একটা গা তো। উদাসীমায়ের কথায় আবেগ। এত সুন্দর গলা, এত সুন্দর গান গাস, একদম জানাসনি। নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল! রাতে গানের আসরে তোকে গাইতেই হবে। তোকে আর ছাড়ছি না। টপ্পা গাওয়ার লোক তো উঠেই গেছে। কি গলার কাজ! দেখ, অনেকেই গান জানে। শেখেও। কিন্তু গলা পায় না। গলা নিয়ে জমায় মানুষ। তুই তো দেখছি পাকা শিল্পী।

সুমীরণবাঈ বৈভব সিং চুপচাপ বসে। উদাসীমায়ের ওপর কারুর সাধ্যি নেই কথা বলার। আর সুরশ্রুতি তো মায়ের দিকে তাকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে শুধু। চোখের কোণ দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

উদাসীমা আবার বলেছে বর্ণমালাকে, যাই কর আর না কর, আমার এই কথাটা মেনে চলিস—শিল্পের অমর্যাদা করবি না। গাইবি রোজ। রেওয়াজ রাখবি।

আমার উনি গান খুব ভালোবাসতেন। আমাকে বসিয়ে বসিয়ে শেখাতেন। আমিও ভালোবাসি। ছাড়িনি। গাই। ওঁকে শোনাই। যে যা ভাবে ভাবুক। আমি আত্মাতে বিশ্বাসী। আত্মা অমর। আমার এই ভাবনাটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

লোকে আমাকে পাগল বলে, বলুক। আমার চেয়ে আমাকে আর কে বেশি করে চিনবে!

বর্ণ! সত্যিকারের আমি পাগল নই।

বর্ণমালা মুখ তুলে উদাসীমায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখের পলক পড়ছে না। এ কোন উদাসীমা? সুমীরণবাঈয়ের উদাসীমাকে তো দেখছে না বর্ণমালা! এ যে সত্যিকারের সকলের মা। এ উদাসীমার আর এক রূপ।

বিচিত্র এই জগতের বিচিত্র মন বিচিত্র প্রকৃতি বিচিত্র মানুষ।

শমীকাবাঈকে একরূপে দেখেছে, আবার উদাসীমাকে অন্যরূপে।

কত না বিরক্ত হয়েছে উদাসীমায়ের ওপর! কত না খারাপ ভেবেছে! বার বার সুরশ্রুতিকে আরতির বিষয় প্রশ্ন করাটা পছন্দ করেনি মা-মেয়ে।

উদাসীমায়ের যত সব অবান্তর প্রশ্ন!

কোথায় শিখেছে, কার কাছে শিখেছে। কেন এসব মনে পড়ছে না? কেন মনে পড়বে না?

সুরশ্রুতি চিন্তা করুক। এ আরতি মানুষকে সম্মোহিত ক'রে ফেলে। মানুষ নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। যেন অন্য কোনোজগতে চলে যায়।

সুরশ্রুতি উত্তর দিয়েছে। বার বার বলেছে একই কথা।—উদাসীমা তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। সত্যি আমি কারো কাছে শিখিনি। আমার ভেতর থেকে আপনা হতেই আসে। নতুন লোককে আরতি করে আপ্যায়ন করি। খুশী করি।

নাছোড়বান্দা উদাসীমা। মানতে রাজী নয়।

কি আর করা যাবে!

বর্ণমালার ভাবনায় ছেদ পড়েছে। উদাসীমায়ের কথা কানে যেতে।

উদাসীমা বলছে, হ্যাঁ রে বর্ণ! গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিসটা কি? আকাশ-পাতাল চিন্তা! কেন শমীকাবাঈ স্বামীকে আগলাতে রাজী হয়নি?

মাথা নেড়েছে বর্ণমালা। না, হয় নি। শমীকাবাঈয়ের মতামত সবই জানিয়েছে।

হেসে উঠেছে উদাসীমা!

ঠিক আছে, কোনো ভয় নেই। কে কাকে দেখে! কেউ নয় কেউ নয়। আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। হ'তেই হবে। নিশ্চিত জয়ী হবি-ই।

তবে শোন আমার কথা। জয়ী হবার মোক্ষম মন্ত্র আমাকে বলে দিয়েছেন এলাহাবাদের ত্রিবেণীমা।

প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে গেছলাম মেলায়। অনেক সাধুসন্ত যেমন এসেছে, তেমন ত্রিবেণীমাও। একটা ছোট তাঁবু করে বসে আছেন।

কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই একটা ভজন গেয়ে শুনিয়েছেন। উদাসীমা মিষ্টি গলায় ত্রিবেণীমায়ের ভজন গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছে। দু'চোখ বোজা। কোলের ওপর দু'হাতে তাল দিচ্ছে আর গাইছে।—

এক ভাওনা মে ধ্যান লগা রাখ,
আশা পুরি হো জায়েগী।
এক বিশ্‌ওয়াস সে মত্‌ ভোলো রে
মিলনা জো তেরি মিল জায়গি,
চেত সে চলো
চেত মে রহো,
ঠিক ঠিকানা আর জায়েগি।
তন মন সে এ হি সোচ্‌না,
সব কুছ মিল্‌ জায়েগি।

গান শেষ করে একগাল হেসে উদাসীমা বলেছে সকলের দিকে তাকিয়ে।—তোমরা সকলে এই গানটাকে জপমালা করে বুকের ভেতরে ধরে রেখো। এই

গানটাকে বুঝো। নিশ্চয় মনস্কামনা পূর্ণ হবেই হবে। এক লক্ষে এক ভাবনায় মনকে সদা-সর্বদা ধরে রাখতে চেষ্টা করবে। শর্ত বাধা-বিঘ্ন ঝড়-ঝঞ্ঝাতে এতটুকু বিশ্বাস হারাবে না। তোমাদের সব ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। তোমরা মন প্রাণ দিয়ে এই চিন্তা ক'রো। নিশ্চয় ফল পাবে। নিশ্চয় নিশ্চয়।

এ জীবনের গান। চিরকালের সব দেশের। সব মানুষের সব বয়সের। সব প্রশ্ন সব উত্তর। সব সমাধান। গানের প্রতিটি বাণী মন্ত্র। গানের ভাবধারা ধ্যান।

ঘরের পরিবেশটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে।

উদাসীমা মৌন কিছুক্ষণ।

আবার আস্তে আস্তে মুখ খুলছে। আকাশের বুক থেকে এক একটা কথা ভেসে আসছে যেন উদাসী মায়ের মুখে।

সে এক স্বর্গের দৃশ্য। স্বর্গের ভাব বললেই চলে। ত্রিবেণীমা বলতে বলতেই কি রকম যেন হয়ে গেছে। একটা মোলায়েম সুন্দর লাবণী সারা শরীর দিয়ে বয়ে গেছে।

কলকাতার কুমোরটুলিতে বিখ্যাত সেন বংশদের বাস। সেন বংশ বলতে ধন্বন্তরি কবিরাজদের বংশ। সেই বংশেরই কবিরাজ কালিভূষণ সেন।

কালিভূষণ সেনের মেয়ে রত্নমালা সেন তখনকার দিনের সুকণ্ঠী বেতার শিল্পী।

কাশীধামে দেবীশক্তিমাতার দর্শনে বাপ-মেয়ে গেছে। সে সময় সেখানে ত্রিবেণীমা উপস্থিত। আরো অনেকে।

মেয়েটি আত্মস্থ হয়ে গান শোনাচ্ছে। গান শুনতে শুনতে দেবীশক্তিমাতা যেন অন্য জগতের হয়ে গেছেন। এ জগতের নয়। জ্যোতির্ময়ী জ্যোতিরূপা।

গান শেষে, খানিক বাদে দেবীশক্তিমাতা তাঁর মধুর কণ্ঠের যে সব উপদেশ দিয়েছেন, ত্রিবেণীমায়ের মুখ থেকে এনে সে সব কথাই বলেছে এখানে।

উদাসীমা চোখ বুজে হয়ত সেই সমস্ত উপদেশ স্মরণ করছে।

সমস্ত ঘরখানা নিস্তব্ধ-নিঝুম। কারো আস্তে নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

বসন্ত পঞ্চমী।

রাত পোহাবার আগে থেকেই, সাজো সাজো রব। বাসন্তী রঙের পোশাকে সেজেছে রাজপুত যুবকেরা। পাঞ্জাবি পাজামা পাগাড়ি। স্ত্রীলোকেরা পাগড়িতে ভগবতীদেবীর আশীর্বাদী শমীপাতা গুঁজে দিয়েছে।

শিকার উৎসব—আহেরিয়া।

এ দিন রাজপুতদের শিকার করবার শুভ দিন।

সারিস্‌কার জঙ্গলে এসেছে সবাই। এসেছে বৈভব সিং, সুরশ্রুতি, সুমীরণবাঈ, বর্ণমালা, উদাসীমা। এসেছে বীরগুণ সিং শমীকাবাঈ, নানা দেশের লোকেরাও। এখানে শিকার নিষেধ। জন্তু-জানোয়ার নির্যাতন করাও।

তবে আসা কেন?

পূর্বপুরুষদের আগেকার কালের স্মৃতিস্মরণ। জঙ্গলের রাস্তায় এক একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। পায়ে হেঁটে সকলে ঘুরে-ফিরে জন্তু-জানোয়ার দেখছে। অনেকে জিপগাড়িতে চড়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে। খাবার-দাবার না পেলে, বানর দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসছে। লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করছে এদিক-ওদিক।

বাচ্চারা হাততালি দিয়ে নাচছে চিৎকার করছে। ময়ূর সার বেঁধে নির্ভয়ে রাস্তার এপার ওপার করছে। শিং-ছাড়া হরিণমুখো দুটো নীলগাই গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই লুকিয়ে পড়েছে। নিমেষের দেখা। বেচারারা! জল খেতে এসেও জল খেতে পেল না। ভয়! মানুষের ভয়।

দু'দিকে থাক-থাক বাহারি শিঙের হরিণ জঙ্গলের ভেতরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

আচমকা একটা গম্ভীর 'হুম্' শব্দের আওয়াজ। একবার হয়েই থেমে গেছে।

ভয়ে-ত্রাসে সকলের ছুটোছুটি। যে যার গাড়িতে উঠে পড়েছে। বাতাসে একটা মাত্র আওয়াজ ঘুরপাক খেয়েছে—বাঘ, বাঘ, বাঘ!

বাঘের ছবি তুলবে বলে দু-একজন ক্যামেরা হাতে তাক ক'রে দাঁড়িয়ে আছে গাছের আড়ালে।

গাড়িয়ে ওঠেনি সুরশ্রুতি। উদাসীমা হাত ধরে টানাটানি করছে।—ভেতরে চল,

ভেতরে চল। সব সময় দুঃসাহস ভালো নয়। জায়গা বিশেষে সব সাজে।

আচমকা বীরগুণ সিং দৌড়ে এসে সুরশ্রুতির আর একটা হাত টানতে লাগল। টানছে টানছে টানছে।

সুরশ্রুতির চিৎকার। কিছুতেই যাবে না সে।

বীরগুণের গাড়ির ভেতর শমীকাবাঈ বসে। কি দাপাদাপি! কি লাফালাফি! কি তারস্বরে চিৎকার।—উসকো জোর করকে লে আয়ো, কই পরওয়া নেহি, কিসিকি বাত মাত মানো। তুম রাজপুত হো। তুমহারা বিবিকো লে আনা তুমহারা হক্ হ্যায়।

অমন ঠাণ্ডা মানুষ বৈভব সিং রাগে ফেটে পড়েছে! সহ্য করতে পারেনি। ছুটে এসে এক থাপ্পড় মেরেছে বীরগুণ সিংয়ের গালে।—ছোড় বেওকুফ।

সুরশ্রুতির হাত ছেড়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে বীরগুণ।

মারবার জন্য বৈভব সিং আবার এগোতেই। শমীকাবাঈ খুব জোরে বলে উঠেছে গাড়ির ভেতর থেকে।—মুমে মত মারিয়ে, মর জায়গা। পায়ের মে আচ্ছা করকে মারিয়ে পাজিকো। জ্যায়সা করম্ কিয়া, অ্যায়সা হালত হোনা চাহিয়ে।

রাস্তা থেকে উঠতে দেয়নি বীরগুণকে উদাসীমা।

কী রণমূর্তি! বুকের ওপর চেপে বসেছে। এক হাত গলায় আর এক হাতে চুলের মুঠি।

উদাসীমায়ের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। কপালের সিঁদুরের টিপ থেকেও বুঝিবা। ওটা কি আরো একটা চোখ!

সকলে হাতজোড় ক'রে হাঁটুগেড়ে উদাসীমাকে ঘিরে বসে আছে।

এযে মা দুর্গার অসুর বধের প্রত্যক্ষ দৃশ্য। মহিষাসুরমর্দিনী!

শমীকাবাঈ গাড়ি থেকে নেমে উদাসীমায়ের সামনে থপাস ক'রে বসে পড়েছে। দু'চোখের জল দু'গাল ভেসে যাচ্ছে জোড়হাতে ক্ষমা চাইছে চাইছে।—দেবীজি! ছমা কিজিয়ে ছমা কিজিয়ে। এ অসুর কো ছমা কিজিয়ে। প্রসন্না হোয়িয়ে, প্রসন্না হোয়িয়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ সকলে।

উদাসীমা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শান্ত হয়েছে। মুক্তি দিয়েছে বীরগুণ সিংকে।

উদাসীমায়ের দু'পা জড়িয়ে ধরে মাথা ঘষেছে বীরগুণ সিং।—মাতাজি কিরপা কিজিয়ে কিরপা কিজিয়ে।

রাত ন'টা।

প্রাসাদপুরীর পেছনের পাথরের মঞ্চের ওপর, খোলা আকাশের নিচে নাচ-গানের

আসর বসেছে আবার।

অনেকের ধারণা ছিল, হয়ত বা বীরগুণ সিং আসবে। না, আসেনি আর।

যথারীতি গান-নাচ শুরু হয়েছে।

নওটংকিরা রাজা-রাজড়াদের কাহিনী শুনিয়ে বেড়ায় গান-নাচের মধ্যে দিয়ে। অন্য গানও যে না গায়, তা নয়। গায়।

পুরুষ মানুষটি তাদের বাজনায় সপ্তমে গলা চড়িয়ে গাইছে। থামলে তার স্ত্রী ধরছে। ওড়নায় মুখ ঢাকা। এদের সকলেরই পুরনো রাজস্থানী পোশাক। বারো-তেরো বছরের ছেলেটি ঢোলক বাজাচ্ছে। দশ-এগারো বছরের মেয়েটি ঘাগরা-চোলি-ওড়নায় সেজে নাচছে। পায়ে কেডস জুতো ঘুঙুর।

মেয়েটি ঘাড়-দেহ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে ঢোলকের তালে তালে, ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে হাসিমুখে নেচে চলেছে। ঠোঁটে হাসি চোখে হাসি। অঙ্গে অঙ্গে হাসির ঢেউ উথলে উঠছে।

সকলের চোখে সুন্দর। অতি সুন্দর। বাহবা দিয়ে উঠছে সবাই। হাততালির পর হাততালি।

মাঝখানের আগুনও নেচে চলেছে। লক্‌লকে শিখা দুলছে-হেলছে। ওপর দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

পুরুষটি গলা ছেড়ে গাইছে।

বন্না রে জয়শলমের জারো।
থারি বন্নি শাড়ি লাজিয়ো।

পুরুষটি থেমে গেছে।

এবার স্ত্রীলোকটির পালা। বাঁ কানে হাত চেপে ধরে গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছে।—

বন্না রে জয়পুর জাজিয়ো
জয়পুর কি চুন্নি লাজিয়ো।

বর তোমার কনের জন্যে জয়শলমের যাও। সেখানে ভালো শাড়ি পাওয়া যায়। পছন্দ মতন কিনে নিয়ে এসে তোমার কনেকে সাজাও।

বর তোমার কনের জন্যে জয়পুর যাও। সেখান থেকে ভালো চুনরি-ওড়না কিনে নিয়ে এসো। সাজালে যাতে কনেকে মানায়।

কেন এই নাচ-গানের আসরে এলো আজ বর্ণমালা! কে জানত আগে, বর-কনের বিয়ের গান হবে! ছাইচাপা আগুন দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে আবার।

সুরশ্রুতির হাসিমুখ ম্লান হয়ে আসছে। জ্যোৎস্না ঢাকা কালো মেঘ।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনি বর্ণমালা। শরীরটা ভালো লাগছে না বলে উঠে পড়েছে। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে সুরশ্রুতিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে আসব থেকে।

ঘরে এসে অবধি আকাশ-পাতাল ভাবনা ভেবে চলেছে বর্ণমালা।

সুরশ্রুতি চুপচাপ। খোলা জানলার আকাশে দু'চোখ।

নিথর নীরব।

ঘরখানা এতো চুপচাপ, মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে বুঝি! যে দু'জন বসে রয়েছে তাদেরও একই অবস্থা। মা-মেয়ে, দু'জনে বিষণ্ণ মৌন।

মৌন কি মুখর হয় না?

হয় বই কি! বাইরে না হলেও ভেতরে খুব মুখর। মনে মনে খুব কথা কয়।

মনে মনে কত কি দেখে। দেখে অতীত। দেখে বর্তমান ভাবে ভবিষ্যৎ।

দুঃখের স্মৃতি ভুলে যাওয়াই ভালো। মানুষ ভুলতে চায়। নতুন ক'রে ব্যথার কথা মনে না আসাই ভালো। তবুও দুঃখ কি কাউকে ছেড়ে যায়? যায় না।

সুখের স্মৃতি মানুষকে অতীতের সুখসঙ্গ দেয়। কিছুক্ষণের আনন্দ। ভালো লাগে। চাওয়া যায বলেই সুখ-স্মৃতি হারায় বারে বারে।

একটা কথা বেশি ক'রে মনে পড়ছে উদাসীমায়ের।

কেউ কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। কেউ কাউকে রক্ষে করতে পারে না। নিজের ভেতরেই শক্তি রয়েছে। নিজের ভেতরেই রক্ষে করার শক্তি রয়েছে। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে নিজেকেই।—আমি নিশ্চয়ই জয়ী হব। আমার শক্তির কাছে সব শক্তি হার মানতে বাধ্য। পরাজয় স্বীকার করতে হবেই হবে। এই মনোভাবকে মনে রাখার সাধনাই শক্তির সাধনা।

পৃথিবীর কোনো দুঃখকষ্ট শোকতাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কখনও কোনদিন নিশ্চয়ই আমি সব অতিক্রম করতে পারব। আমি নিজেই নিজের শান্তি-আনন্দ। আমি নিজেই সকলের শান্তি-আনন্দ।

সারিস্কার জঙ্গলে বর্ণমালা আর সুরশ্রুতি সে-সব পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছে। বীরগুণ সিংকে নিয়ে।

অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গ করেছে উদাসীমা।

এটা ওর সৌভাগ্য বলতে হবে। সকলের উপদেশে উদাসীমা নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে।

এ সুযোগ তো ঘটেনি মা-মেয়ের জীবনে। একটার পর একটাতে শুধু হেরে যাওয়ার পালা। পরাজয় পরাজয়। আর পরাজয়।

সুরশ্রুতিকে নিয়ে বীরগুণ সিং-এর টানাটানি সারিস্কায় জঙ্গলে ওর জীবনে প্রথম নয়। এর আগেও ঘটে গেছে। সেটা দিল্লিতে।

ময়দানে ছবির মেলা বসেছে। এক একজনের সাজানো স্টলে শিল্পী বসে। আবার কেউ কেউ স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে। শিল্প-রসিকদের ঘিরে ভীড়। কেউ কিনছে কেউ দেখছে। কেউ ছবির জন্ম কাহিনীর বর্ণনা শুনছে। উদ্দেশ্য-মানে বুঝছে।

এদের সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র সুরশ্রুতি। জলে ভাসা দু'চোখ। বিষাদ-মধুর মুখ। সকলের মাঝে থেকেও যেন নির্জন নিরালা দ্বীপে বসে। সকলের মাঝে নেই ও। বড় একা। কোথায় মন কোথায় দৃষ্টি! বোধহয় ও নিজেও জানে কি না সন্দেহ!

নিজের হাতে আঁকা ছবির মধ্যে বসে ও-ও পটে আঁকা ছবি হয়ে গেছে।

মানুষজনের চোখে ভালো লাগছে। ওরই স্টলে বেশি ভীড়ে ভীড়। ছবিও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রোজ। আঁকার হাত ওর ভালো। খেটে খুটে মনপ্রাণ ঢেলে শিখেছে। এটা সুরশ্রুতির সাধনা।

মেয়েকে শেখাতে বর্ণমালার কোনো ফাঁকফাঁকি ছিল না কোনো সময়ের জন্য। সুকণ্ঠি বর্ণমালা কোকিল কণ্ঠের মেয়েকে গান শেখার প্রেরণা দেয়নি। সঙ্গীত জীবিকা হয়ে উঠুক এটাও চায়নি। চায়নি তার অনেক কারণও আছে। মেয়ের জীবনে সে ঘটুক, কোন মা চায়!

সুরশ্রুতি ছবি আঁকার অনেক পুরস্কারও পেয়েছিল।

ঈর্ষাকাতর মানুষেরা নিন্দেও কম করেনি।—কত রকমই জানে! লজ্জাশরম যদি এতটুকু থাকে! পটের বিবি হয়ে উনি স্টলে বসে থাকবেন। লোকের চোখ টানবার এ একটা মোক্ষম অস্ত্র।

বোকা বোকা লোকেরা কি বেহায়া! এত স্টল থাকতে ওর স্টলেই যত নজর। শ্যেনদৃষ্টি।

ভীড় আর দৃষ্টি সুরশ্রুতির জীবনে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে একদিন। চারটি তরুণের দুর্ব্যবহারে। চিন্তায় কল্পনায় যা ভাবতে পারে নি এমনটি হবে।

যা ভাবা যায় না বোঝা যায় না জানা যায় না—তাকে কি অদৃষ্ট বলা হয়? হবেও বা!

সুরশ্রুতি নিদারুণ অপমান-লাঞ্ছনাকে অদৃষ্ট বলেই মেনে নিয়েছিল।

সুষম কথাবার্তায় চেহারায় সত্যিই সুন্দর। সত্যিই ভদ্র-অমায়িক।

রোজ সন্ধেয় একবার সুরশ্রুতির স্টলে ওর আসা চাই। আসবে একখানা ক'রে চিঠি নিয়ে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে বার করে সুরশ্রুতির হাতে গুঁজে দেবে। চিঠিটা ওর নিজের হাতে লেখা নয়। বন্ধু সুলভের।

চিঠিটায় কি জাদু আছে কে জানে! কি জিওনকাঠি আছে কে জানে!

হাতে পাবার পর সুরশ্রুতির মুখে একটা না জানা আনন্দের ছোঁয়া লাগে।

চিঠির প্রতীক্ষায় প্রতিদিন। প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা সুষম না আসা পর্যন্ত কোনোকিছু ভালো লাগে না। অস্থির-অস্থির ভাব।

মানুষের আনন্দ অনেক মানুষই সইতে পারে না। এটা হিংসা না স্বভাবের দোষ—কে জানে! না নিয়তির টানাপোড়েন।

সুরশ্রুতির চঞ্চল-অস্থিরভাবের মধ্যেও একটা গোপন আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। এই চঞ্চল-অস্থিরভাব তার অশান্তির মধ্যে শান্তি। বিষাদের মধ্যে আনন্দ।

এমন অবস্থা যখন সুরশ্রুতির জীবনে এসে উপস্থিত, তখনই তার শান্তি-আনন্দের প্রাসাদের ভিত টলমল করে উঠেছে। হঠাৎই।

সেদিন সন্ধের পর ছবির মেলা ভেঙেছে সবে। মাঠ ভর্তি লোকেরা কাগজ জ্বালাচ্ছে, যার যা খুশি গান গাইছে আনন্দে। আলোয় আলো, যেন দেয়ালীর উৎসব।

স্টল থেকে নেমেছে মাঠে সুরশ্রুতি।

সেই চারজন তরুণ যারা ওর স্টলের সামনে এসে রোজই ওকে বিরক্ত করেছে। সুরশ্রুতিকে একলা দেখে দুষ্টুরা দৌড়ে এসে ঘিরে ধরেছে। তাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে। কোনো কথাই শুনবে না আজ।

সুরশ্রুতি যত তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে, ততই ওরা আরো তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

নিরুপায়—-অসহায় মেয়েটি চতুর্দিকে তাকাচ্ছে সাহায্যের জন্যে। কেউ এগিয়ে আসেনি।

না, কেউ আসেনি বললে ভুল বলা হবে। যারা আসবার যে আসবার তারা ছুটে এসেছে। এসেছে সুরশ্রুতিকে উদ্ধার করবার জন্যে। এসেছে সুষম। এসেছে সুলভ।

সুরশ্রুতি এর আগে সুলভকে এত সামনাসামনি দেখেনি। এই প্রথম দেখেছে। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ সুঠাম অঙ্গ। দেহে মনে প্রচুর শক্তি। দৃষ্টি এড়ায়নি। ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ও একাই একশ। চড় কিল লাথি। বিনা বাধায় চালিয়ে গেছে সুলভ।

অপরাধী মনের তরুণরা, অপরাধের বাসনা নিয়েই এগিয়ে এসেছিল। সেখানে

ওরা মনের দিক দিয়ে অতি দুর্বল।

সম্মুখ সমরে সুলভের সামনে চারজনের একজন ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। যে যেদিকে পেরেছে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

প্রতিদিন দূর থেকেই নজরের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুরশ্রুতিকে লক্ষ করে এসেছে সুলভ। নিজেকে গোপন রেখেই গোপন কথা লিখে পাঠিয়েছে সুষমের হাত দিয়ে। চিঠির পর চিঠি। ভালোবাসার ভালো কথা।

প্রথম প্রথম সুরশ্রুতি অতটা বোঝেনি। ভেবেছে সুষমই লেখে অন্যের নাম দিয়ে। আজ দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি সুলভেরই লেখা চিঠি।

সুলভ-সুষম নিজেদের গাড়ি করে সুরশ্রুতিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

বর্ণমালা আর সুরশ্রুতির সঙ্গে সুলভের হৃদ্যতা গড়ে উঠতে এতটুকু সময় লাগেনি। মা-মেয়ের কৃতজ্ঞতার পাশে বাঁধা।

শত শত ধন্যবাদ দিয়েও সুলভকে অনেক কিছুই দেয়া হয়নি। বাকির পর বাকি থেকেই যায়। বর্ণমালা সুলভকে চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, সোনার চাঁদ বাবা আমার! তোমার ঋণ কি দিয়ে শোধ করব জানি না। এ ঋণ শোধ করা যায় না। তোমার জন্যেই মেয়েটাকে পেয়েছি। না হলে কি যে হতো, কি যে হতে পারত। ভাবতেও শিউরে ওঠে সারা শরীর!

সুরশ্রুতির দিকে তাকিয়ে সুলভের চোখে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। বর্ণমালার কথায় কোনো উত্তর জোগায়নি মুখে।

কিছুদিন পর।

সুলভ নিজের মনের ইচ্ছেটা পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে বর্ণমালাকে। —সে সুরশ্রুতিকে তার নিজের মতো করে গড়ে নিতে চায়।

বর্ণমালার বুঝতে বাকি নেই সুলভ কি বলতে চায়।

প্রথমে চুপ করে থেকে কোনো মতামত জানায়নি। সময় চেয়েছে দুদিন।

বর্ণমালার এ ধরনের সময় নেয়ায় হতাশা এসে গেছে সুরশ্রুতির মনে। বিষণ্ণ মুখ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে সুলভ! কাছে এসে পিঠে হাত বোলাতে চাপা গলায় বলেছে—অত ভেঙে পড়েছ কেন সুর? সব ঠিক হয়ে যাবে।

করুণ মুখে বিশ্বাসের তরুণ হাসি ফুটে উঠেছে সুরশ্রুতির।

মেয়েকে জীবনে ভালোমন্দ—কোনো কিছুই গোপন করে রাখেনি সুলভের কাছে বর্ণমালা।

আদ্যন্ত সমস্ত শুনেও সুলভ তার সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়েনি। হাকিম টলে তো হুকুম টলে না। সে বুঝেসুঝেই পা বাড়িয়েছে। জেনেশুনেই সুরশ্রুতিকে গ্রহণ করতে চাইছে।

বর্ণমালা মন থেকে চাইছে না এ বিয়ে।

নিজের অতীত বারে বারে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। বর্ণমালার সেই আশঙ্কা। মেয়ে সুখী হোক এটা অন্য মায়েদের মতন সেও নিশ্চয় চায়। ভয়। যদি না হয়!

এ বিয়েতে মেয়ের পূর্ণ সম্মতি। তবুও বর্ণমালা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সুর এখনকার মতন নয়। ছোটবেলা থেকেই ওর মন গড়ে উঠেছে অন্য ধাতুতে। চিন্তাধারা অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। বর্ণমালার চেয়ে এটা অন্য কারোর জানা সম্ভব নয়।

সুর কিছুতেই খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না কারো সঙ্গে। অসম্ভব। আগে ভালোরকম জ্ঞান হয়ে গেছে বর্ণমালার। মেয়ে প্রায়ই আনমনা। চেনা মানুষ সময় সময় অচেনা হয়ে যায় ওর কাছে। কথা কানে যায় না কারো। ও যেন এ দুনিয়ার মানুষ নয়। অন্য জগতের। সংসারের পক্ষে একদম উপযোগী নয়ই।

হ্যাঁ, তার অবর্তমানে সুরকে দেখবে কে! এটা অতি সত্যি কথা। অস্বীকার করে না বর্ণমালা। সবজায়গায় কি? কিছু কিছু বাদ পড়লেও পড়তে পারে। ওর জীবনে তেমন ঘটনা নাই ঘটুক। কে নিশ্চয় করে বলতে পারে কি ঘটবে না! ঘটে, অনেকের জীবনে ঘটেছে। ভরসার পরমায়ু মাপ করা যায় না।

তবে কি মা হয়ে মেয়েকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দেবে?

আর ভাবতে পারছে না বর্ণমালা। দেহে-মনে বড় ক্লান্ত। ভেতরটা বড় দুর্বল হয়ে গেছে। আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

একগুঁয়ে নাছোড়বান্দা সুলভ বর্ণমালার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে। রুদ্ধশ্বাসে বসে! একটা সহজ ব্যাপারে মতামত দিতে এত দেরি কেন?

সামনাসামনি সোফায় বসে সুরশ্রুতি। মলিন মুখ। হাসির লেশ মাত্র নেই। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নিজের বুকটা চেপে ধরে আছে। একটা যন্ত্রণা। মায়ের ভাবগতিক মোটেই ভালো লাগছে না। উত্তর স্রেফ একটা শব্দ—হ্যাঁ। সব ঝামেলাই চুকে যায়। তা নয়! মা একটা গুমোট আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। না জানে সুলভ কি ভাবছে! এক আসনে বসে বসে কত না কষ্ট পাচ্ছে!

মায়ের কি দেখান ভালোবাসা শুধু! মা চায় না কি তার সুখ-শান্তি!

কোনদিন জীবনে অবাধ্য হয়নি সুরশ্রুতি। এবারে বাধ্য হয়েই অবাধ্য হতে হবে। মায়ের এ মনোভাব কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

এই ঝড় যখন সুরশ্রুতির ভেতরে বয়ে চলেছে, ভেতরটা তছনছ ক'রে দিচ্ছে—ঠিক এইসময়ে সুলভের ভেতরে দ্বন্দ্ব অবিশ্বাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে প্রবল।

সুলভ ঠিক করেই ফেলেছে বর্ণমালার কথা অমান্য হয় হবে। কোনো আদেশই মানবে না কোনোও কথাই শুনবে না।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছে, উঠতে পারে নি। সুরশ্রুতির একই অবস্থা। উঠেই ধপাস করে বসে পড়েছে আবার।

মর্মছেঁড়া একটা বিস্ময়!

বর্ণমালার বুক ভাঙা ব্যথার নিঃশ্বাস ঝরে পড়েছে জোরে। দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়েছে।

একটু আগের অভিমান অভিযোগ দ্বন্দ্ব অবিশ্বাস নিমেষে ধুয়ে মুছে গেছে ওদের মনের আকাশ থেকে। সুরশ্রুতি আর সুলভের।

ছুটে এসেছে দু'জনে। মায়ের পায়ের কাছে বসে পড়েছে।

সুরশ্রুতির চোখের কানায় কানায় জল টলমল করছে। মা কি ওদের মনের কথা বুঝে ফেলেছে!

কেন কাঁদছে?

মা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। কক্ষনো না। কোনদিন না। আমি কথা দিচ্ছি তুমি শান্ত হও তুমি চুপ কর।

সুরশ্রুতির মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বেরোয় নি। দু'পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

সুলভও নিজেকে ধরে রাখতে পারে নি। দু'চোখ উপচে জল ঝরছে।—মা! সুর তোমার কাছেই থাকবে। তোমার বুক থেকে কখনই আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাব না। তুমি যা চাও, আমি তাই মেনে নেব। নিশ্চয় মেনে নেব। কথা দিচ্ছি।

বর্ণমালা হাতেতেই দু'চোখের জল মুছে নিয়েছে। কিছুক্ষণ কোনো কথাই কয় নি। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দু'জনে। সুরশ্রুতি আর সুলভ। মুখের মৃদুহাসি আর চোখের খুশীর জেয়ার দেখবে বলে।

অপেক্ষা অপেক্ষা।

খুব আস্তে। আস্তে আস্তে বর্ণমালা বলেছে।—

না সুর আমি চাই তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। তোমরা ভুল বুঝো না।

মুখ ফিরিয়ে সুলভের দিকে তাকিয়েছে সুলভ! সুর তোমারই থাকবে। এই বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে তোমাদের সংসার জীবনে খুব সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

এটা মনে রাখতে হবেই হবে। ভুললে চলবে না মোটেই।

স্বপ্ন আর বাস্তবের অনেক সময়ে মিল থাকে না। মেলে না। তফাৎ তফাৎ—অনেক তফাৎ আসমান-জমিনের।

প্রেমিক কখনও আদর্শ স্বামী হতে পারে না। প্রেমিকও হতে পারে না কখনও আদর্শ স্ত্রী। ভুললে চলবে না।

প্রেম স্বপ্ন কল্পনা মায়া আর পাগলামো। যতক্ষণ স্বপ্নরাজ্যে মায়ারাজ্যে দু'জনের চোখের কাজল হয়ে থাকবে, ততক্ষণ দুজনের বাঁধন। কিন্তু চোখের কাজল ধুয়ে গেলে, বাস্তবের আলোয় প্রেম থাকে না। সব উবে চলে যায়।

বর্ণমালার জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে অনেক। পশু-পাখির থেকেও অনেক শিখি আমরা। প্রেমিক প্রেমিকা সংসারের দায়-দায়িত্ব নিতেও অক্ষম-অনিচ্ছা।

কোকিলের ব্যাপারটা তো অনেকেরই জানা। যেখানেই প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে যেখানে সুন্দর বসন্ত, সেখানেই তার আগমন। মরুভূমি তার পছন্দ নয়। নেচে গেয়ে বেড়াবে আনন্দে। নিজের বাচ্চাদের ও মানুষ করবে না। কাকের বাসার ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিম রেখে দিয়ে আসবে। বাচ্চা উড়তে শিখলে কাকের চোখের আড়ালে গিয়ে নিজের বাচ্চাকে উড়িয়ে নিয়ে আসবে।

এসব দেখেশুনে পরিষ্কার মনে হয়, যে যতই বলুক প্রেমের পক্ষে, স্বপ্ন-বিলাসীদেরও স্বপ্নভঙ্গ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাইরে থাকলেও মনে মনে বিচ্ছেদ নিশ্চিত।

দুজনের মুখের রেখা পড়তে চেষ্টা করছে বর্ণমালা। ওদের মনের প্রতিক্রিয়াটা জানতে চেষ্টা করছে।

প্রথমে সুলভ বলেছে, আমি চিরকালই স্বপ্নবিলাসী। আমি আমার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। সুর স্বপ্নলোকের মেয়ে। ওর চোখে স্বপ্ন মনে স্বপ্ন। সেইজন্যেই ওকে বেশি পছন্দ আমার। আমার জন্যে ও তৈরি। স্ত্রী হোলেও ওকে আমি স্বপ্নের মূর্তি করে গেড়ে রেখে দেব। ও সংসারের নয় জেনেও এই বিষয়ে আমি সাবধানী।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠেছে বর্ণমালার। দু'পাশ থেকে দু'জনের দু'হাত টেনে নিয়ে মিলিয়ে দিয়েছে। সুলভের হাতের ওপর সুরশ্রুতির।

বিয়ের পর।

প্রথমেই নিদারুণ ধাক্কা খেয়েছে সুরশ্রুতি। প্রাণভরা বুকভরা আনন্দ নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসেছে। সেই জন্যে। নিয়তি যে একটা মোক্ষম মারণাস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা কল্পনা করতেও পারে নি।

যার হাতে এনে সঁপে দিয়েছে সুলভ সুরশ্রুতিকে, সে আর কেউ নয়—সুলভেরই

স্ত্রী পুষ্পকলি।

এরকম একটা না জানা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পরে পুষ্পকলি হতভম্ব হতবাক। একটা নিশ্চল পাথরমূর্তি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে সুরশ্রুতি। কি করবে। কি উপায়! এ কি পরিস্থিতি! ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না।

হঠাৎ পাথরমূর্তি নড়ে উঠছে। সারাদেহ থরথর করে কাঁপছে পুষ্পকলির।

সুরশ্রুতি পুষ্পকলিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছে,—দিদি! আমি কিছু জানি না। জানলে আসতুম না। তোমার জিনিস তোমার থাক। আমি চলে যাচ্ছি। তুমি শান্ত হও।

সুরশ্রুতির চোখের জলে পুষ্পকলির বুক ভিজেছে আর পুষ্পকলির চোখের জলে সুরশ্রুতির।

কি করুণ দৃশ্য!

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে সুলভ। এরকম একটা পরিস্থিতি পরিবেশ যে ঘটে যাবে, চিন্তার বাইরে।

পুষ্পকলি সুলভের সুখশান্তির জন্যে সবকিছু ত্যাগ করেছে। ওর ভালোবাসা নিশ্চয় নিখাদ। একেবারে নির্ভেজাল। সুলভ যাতে সুখী হয় সেটা পুষ্পকলি মেনে নেবে। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই সুরকে সে ঘরে এনেছে। এখন দেখছে বিপরীত ফল।

পুষ্পকলিকে নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে সুরশ্রুতি।—আঁকড়ে ধরেছে পুষ্পকলি।

না, না। এ বাড়ি থেকে তোমার যাওয়া চলবে না। আমি যতদিন, তুমি ততদিন।

দালান থেকে ঘরের ভেতর দৌড়ে চলে গেছে পুষ্পকলি। গয়নার বাক্স এনে, খুলে এক একটা বার করছে আর সুরশ্রুতিকে পরিয়ে দিচ্ছে। মাথর মুকুট থেকে পায়ের তোড়া অবধি। একেবারে বিয়ের কনের সাজ। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে। ওপরে। দোতলায় সাদা-কালো পাথর বসানো ঘরে।

প্রণাম কর। মা, বাবা।

পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে সুরশ্রুতি।

একটা শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস ছুঁয়ে গেছে সুলভকে। নিশ্বাস টেনে নিয়েছে বুক ভরে প্রাণমন জুড়িয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম সুরশ্রুতিকে এড়িয়ে গেছে বাড়ির প্রায় সকলে। এটা অবিশ্যি যতটা সম্ভব

সুরশ্রুতি না জানতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছে সুলভ। দিবারাত্রি কাছে থেকেছে যাতে মনে কোনো আঘাত না লাগে।

এই কাছে থেকে থেকে আগলানোটা সকলের নজরে পড়েছে। এমনি নজরে নয়, একেবারে বিষনজরে।

সুলভের বড় বাড়াবাড়ি।

এক তো যা কাণ্ড করে বসেছে কাউকে না জানিয়ে, তাতে লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকা উচিত। তা নয়, সব কিছুর মাথা খেয়ে বসে আছে বেহায়া। যতই লেখাপড়া শিখুক, যতই সহেবসুবোর সঙ্গে মিশুক—এ বাড়ির কেউ এমনতর নয়। প্রত্যেকেই আজ অবধি বংশের ধারা বজায় রেখেছে। অক্ষুণ্ণ।

আদরের দুলাল তা ভেঙে তছনচ করে দিয়েছে।

জ্ঞাতিগুষ্ঠি আর আশপাশের লোকেরা ওরাই-যত অশান্তির বীজ বুনে চলেছে। ও বাড়ির লোকেদের মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে।

সুলভের মা-বাবা কিন্তু নিস্পৃহ।

দিনকাল খারাপ। অতি স্নেহের সন্তান। অনেকের বাড়িতে এর চেয়েও তো অনেক বাড়াবাড়ি হয়। ছেলে যদি কিছু করে বসে, তখন? যুগ পাল্‌ছে, সময় পাল্‌ছে। মানুষের মনও বদলেছে। সব বুঝেশুনে চলতে হবে।

এসব শুনেও কি নিন্দুক লোকেরা চুপ করে বসে থাকে! যার যা স্বভাব, করে যাবেই।

তুষের আগুনের মতন অশান্তির আগুন নেভেনি বাড়িতে জ্বলেই চলেছে। সবেতেই সুরশ্রুতির দোষ ধরার চেষ্টা।

নিন্দুকেরা অমন ফুলের মতো মেয়ে পুষ্পকলিকে নিয়েও কত না রটনা শুরু করে দিয়েছে।

পুষ্পকলি নাকি খুব ধড়িবাজ! কেমন সুরশ্রুতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আটকাল! এটা কেউ বুঝল না যে, কতখানি জব্দ করার কৌশল। আদর করার নামে ভালোবাসার নামে এমনভাবে সুরশ্রুতিকে আটকে রাখছে আগলে রাখছে, যাতে সুলভের কাছ থেকে অনেক দূরে দূরে থকে সুরশ্রুতি।

জব্দ আর কাকে বলে। পুষ্পকলি নিজে তো স্বামীর কোনো সম্পর্ক রাখেই নি। আট ন'বছরের ছেলে দুটোকেও সুলভের ধারে কাছে যেতে দেয় না একদম।

লোকে বোঝে না পুষ্পকলিকে—অন্তত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ওকে মাথায় তুলে কি নাচানাচি! কি সরল কি ভালো কি উদার! দেবী দেবী। তা না হলে এমন হয়! সতীন হচ্ছে কালসাপিনী, তাকে ঘরে পোষা! চলে যাচ্ছিল, ছেড়ে দে—তা

নয় আটকালো। ইতিহাসের কোনো পাতায় এমন একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ!

বাড়ির লোকে যাই বুঝুক যাই বলুক—পাড়াপড়শী আর জ্ঞাতি-স্বজন এটা মানতে রাজি নয়। কাছে থেকে মানুষ ভালোমন্দটা বুঝবে কি করে! দূরের লোকেরাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

বুঝবে বুঝবে। একদিন পুষ্পকলিকে সবাই বুঝবে। কি সাবধান করবে সকলে। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। কর্তা গিন্নীরই যত প্রশ্রয়। সুলভটাকে কি চিজ তৈরি করেছে, এখন নরলোকে দেখছে। পুষ্পকলিকেও টের পাবে একদিন। আদরের দেবী। আ-হা-হা-হা!

এতদিন! যত দরদ ঐ অজ্ঞাত কুলশীল—কোথাকার মেয়ে কে জানে, তার ওপর। এটা বাড়ির লোকে বুঝল না গা! আশ্চর্য! পাঁচ বছরের ছেলেও যে বোঝে।

অমন সোনার সংসারটা ছারেখারে যাবে। কারো কোনো হাত নেই বাঁচাবার। শুধু বাইরে থেকে চেয়ে চেয়ে দেখা কান পেতে শোনা, এ ছাড়া উপায়ই বা কি! শিবের অসাধ্য রোগ। স্বয়ং ভগবান এসেও ওদের রক্ষে করতে পারবে না।

পুষ্পকলি নিজের মতেই চলেছে। কারো কোনো কথাতেই কান দেয় না। কান না দিলে হবে কি! কানে কানে ফিসফিস ক'রে সব কথা শোনাবার লোকই রয়েছে তার পাশে পাশে। সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে। কাজের লোক রহলা।

রহলা।

রহলা বীরভূমের মেয়ে। ঝগড়াটে দজ্জাল নামে বিখ্যাত। কতবার বাড়ি থেকে তাড়ানো হয়েছে। গিয়েও যায় নি। ফিরে ফিরে এসেছে. বৌদির টানে। বৌদিকে বড় ভালোবাসে বলেই আসে। ওর নাকি নিজের বৌদি পুষ্পকলির মতোই ছিল। আহা! তাড়াতাড়ি চলে গেছে। এ জগতে ভালো মানুষ থাকে না বুঝি বেশি দিন। সেই-ভাবনা রহলার দিনরাত, বৌদির জন্যে। বৌদি কখন না সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়।

রহলার নাকি ত্যাগ অনেক। যে পাত্রের সঙ্গে রহলার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, রহলাকে দেখে সে নাকি বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে পালাচ্ছিল। রহলা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এসে পিঁড়িতে বসিয়েছে। প্রাণের বন্ধু পাঁচুবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে রহলার পুরুষের ওপর বিদ্বেষ আর ঘেন্না। ঘেন্না আর বিদ্বেষ।

ও নিজেকে নিজে তৈরি করেই নিয়েছে। জীবনে বিয়ে-থা করবে না। ওর ধারণা, ও খুব সুন্দরী। যার বরাত ভালো সেই ওকে বিয়ে করবে. সবার জন্যে ও আসেনি।

রামা-শ্যামা ওর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়। তার চেয়ে কুমারী হয়ে তাকবে সারাজীবন, সেও ভালো।

বৌদির সেবা করে যাবে মরণ অবধি। এতে সে ধন্য। মহাপুণ্য তার।

সকলেই জানে, রহলা পুষ্পকলির সঙ্গিনী।

বৌদির ছায়া।

বড় ব্যথা। খুব ব্যথা পেয়েছে সুলভদা বিয়ে করেতে। বৌদির মনের দুঃখ বোঝে। কি করে শান্তি দেয়া যায় সেই চেষ্টায় ত্রুটি নেই তার। তার ধারণা যদি সুরশ্রুতিকে সুলভের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে পারা যায়, তাহলে বৌদি শান্তি পায়।

ছুতো খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা। পাড়াপ্রতিবেশীদের মনোভাব, জ্ঞাতি-স্বজনের কানাকানি—সমস্তই কান পেতে শুনবে রহলা আর মনে রাখবে। বাড়ির কর্তা গিন্নি থেকে শুরু করে কাজের লোক পর্যন্ত, সবার মনকে বিষিয়ে তুলেছে সুরশ্রুতির ওপর।

খারাপ পথই হোক আর ভালো পথই হোক, যে পথে যেতে চায় মানুষ—সে ঠিক তার সেই পথ খুঁজে পায়।

রহলা পেয়েছে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ে গেল। ওর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ।

সুরশ্রুতির কাছে নিয়ম আসতে শুরু করে দিয়েছে। সুরশ্রুতি একা থাকলেই তার সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটায়। ওর জন্যে না কি রহলার মন বড় আনচান করে। সুরশ্রুতির ব্যথা রহলা বোঝে, এ বাড়ির কেউ না বুঝলেও।

বৌদির উচিত নয় সুলভদার কাছ থেকে তোমাকে এবাবে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা। ছি ছি ছি। কি অধর্ম! কি অন্যায়! ঘোর কলিকাল এল গা! ভালো মানুষের আর বাঁচাবার কোনো উপায় নেই দেখছি। নতুন বৌদিকে যে কোনো ভাবে বাঁচাতেই হবে। জীবনমরণ পণ করেছে রহলা।

রহলা গা মুছিয়ে দেয়, চুল বেঁধে দেয়। আদর করে কত না গান শোনায়। সুরশ্রুতি নির্বিকার।

কোনো কিছুতেই মনে দাগ কাটে না। হাসি মশকরা গান—কিছুই কানে ঢোকে না। তবু রহলা কানে ঢোকাবার চেষ্টা করে। ছাড়বার পাত্রী নয়। যা ধরবে সে, শেষ না করে ছাড়বে না। রহলা গান শোনায়।—

কত সাধ ছিল মনে
সুরমা ভরি দু'নয়নে।

এলোকেশী

কুলনাশী

পোড়ার মুখো কয় ক'জনে।

গানের শেষে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে—

নতুন বৌদি! তোমার এত রূপ, কত পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। তাই না! সে সবদিনের কথা তোমার মনে আছে তো? বল না একটু শুনি। শুনতে ইচ্ছে করে। আমার তো সবই মনে পড়ে। ছোঁড়াদের চুলের মুঠি ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়েছি। কাছে ঘেঁষতে ভয় পেয়েছে ওরা।

তুমি আমার মতো নও। ঠাণ্ডা। মাটির মানুষ। কাউকে সরাতে জানো না, তাড়াতে জানো না। নিশ্চয়ই তারা পালাত না তোমার কাছ থেকে।

ভামিনী এসে পড়েছে।

হ্যাঁ রে, অ্যাই রহলা! নতুন বৌদির কানে কি মন্ত্র ঝাড়ছিস!

রহলা ক্ষেপে উঠেছে। ছড়া কেটে ঝগড়া আরম্ভ করে দিয়েছে।—

ভামিনী রে ভামিনী

এ বুড়ি ভামিনী

তুই কেন মরিস নি

লোকে কথা কয় না

যমে তোকে ছোঁয় না।

ভামিনীও বীরভূমেরই মেয়ে। ছাড়বে কেন! শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হাত মুখ নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসেছে। সুর করে করে বলেছে।—

রহলা লো রহলা

পোড়ার মুখী রহলা

তোর নামে জটলা

ছি ছি ছি

আক্কেলে তোর হলো কি

মুখ দেখানো দায়।

হায় হায় হায়

লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

সুরশ্রুতি উঠে পড়েছে। ছবি আঁকবে।

রহলা পালিয়েছে।

ভামিনী সুরশ্রুতি কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, রহলা থেকে সাবধান থেকো নতুন বৌদি। ও মেয়ে সর্বনেশে, প্রাণে মারবে শেষে।

ফরাস পাতা ঘরে। ঝাড়লণ্ঠনের আলো জ্বলছে।

ঘর ভর্তি লোক।

সুলভের বন্ধুবান্ধব আর আপনজন। সকলের ধরাধরির জ্বালায় আজকের সন্ধেয় গানের অনুষ্ঠান।

বিয়ের পর সুলভ কোনো অনুষ্ঠান করেনি। কাউকে মিষ্টিমুখ করায় নি। আর বৌয়ের মুখও দেখায় নি। অবিশ্যি এটা বন্ধুবান্ধবদের কথা। আপনজনেরা তো শোনাবার পরেই নিজেরা উপযাজক হয়ে দেখে গেছে। তবে সুলভ দু'পক্ষকেই জলযোগের নেমন্তন্ন করেছে। না করলে চতুর্দিক থেকে কথার বিষবান এসে তার সারাশরীরে বিঁধতে থাকবে। এমনিতেই তার 'মহাকৃপণ' আখ্যা। বিশেষ ক'রে ছোটদের কাছে। সুলভদা একটা লজেন্স দেয় না সুলভ মামা, একটা ডলিপুতুল দেয় না—এরকম জানা-অজানা কত বাচ্চাদের কত আব্দার সুলভকে সহ্য করতে হয়। তবু ওর বদনাম ঘোচে না। জ্যোতিষীরা বলে, সুলভের হাত রবির ঘরে যশভাগ্যে নাকি তিল আছে। এই অপবাদ জীবনভোর শুনতেই হবে। অগত্যা সুলভ হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছে। বিধাতার লেখা, তার না হলো শেখা।

বন্ধু-বান্ধব আসছে। উপহার দিচ্ছে সুরশ্রুতিকে। সুলভ হাসিমুখে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ঘরময় খুশীর জোয়ার।

হঠাৎ জোয়ার যেন বিপরীতে বইতে শুরু করে দিয়েছে। উজানে।

একটা গুন গুন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে মুখ থেকে কানে, কান থেকে মুখে।—এ আবার কি কাণ্ড! এমন তো কেউ কখন দেখেনি, কেউ কখন শোনে নি। নতুন বৌয়ের অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্তিকলাপ। কাউকে জিজ্ঞেস করা নয় মতামত নেয়াও নয়। উনি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধা! যা খুশি তাই করবে। এ বাড়ির কর্তা গিন্নি দুর্বল বলে তাই সম্ভব। পৃথিবীতে ওদেরই যেন আদরের নয়নমণি! যা ইচ্ছে তাই করবে আর ওরা মাথা পেতে মেনে নেবে। রামো ছিঃ! অসভ্যতা চোখে আর দেখা যায় না। কেউ যেন মা-বাপ হয় নি, কারো বাড়িতে ছেলে বৌ যেন নেই! চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা। কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছে! রাত কেমন কাটবে কে জানে! ভগবান রক্ষে করুন।

ঘরের ভীড় ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে।

সুলভ কাছে এসে এসে জোড় হাত করে অনুরোধ করছে, আপনারা যাচ্ছেন কেন সবাই! বসুন বসুন।

গলায় বিনয়।—একটু মিষ্টিমুখ—

না, আমাদের শরীর খারাপ।

শরীর খারাপ মাথা ধরেছে বুক ধড়ফড় করছে। গা ঝিমঝিম চোখের যন্ত্রণা। এক একজনের এক এক অজুহাত।

বন্ধুবান্ধবদের মহা আনন্দ। তাদের যাবার নাম নেই। সুরশ্রুতির গান শুনে তবে যাবে।

যাবে কেন? ওই নতুন বৌ নিশ্চয় গুণতুক জানে। বন্ধুবান্ধবের এক একজনকে আরতি করার কি বহর! থালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণডালার মতো সাজিয়ে উনি নাকি আরতি করেন। ওর দুনিয়ায় এটাই অতিথি আপ্যায়ন। লজ্জায় মরি ঘেন্নায় মরি। ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে রহলা।

পড়শীদের আপসোসের অন্ত নেই।

বনেদী বাড়ির নাম ডুবল এবার। বাঁচার কোনো রাস্তাই নেই আর। পাপ ঢুকেছে। রক্ষে হবে কি করে! আ-হা-হা-গো! মাথ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। নিজেদের বুকে কিল ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে। কিছু করতে পারল না তারা। পারছে না পারবে না। খালি হায় হায় করা ছাড়া উপায় নেই। কেন যে এমন নরম মন করেছে তাদের, ভগবান জানেন। ভগবানকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছে।

আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

যে যা খুশি ভাবুক যে যা বলুক—এক মুহূর্তে। একটা মিষ্টি দখিনা বাতাস এসে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে অন্য মানুষ অন্য মন অন্য প্রাণ।

ফিরে যাচ্ছিল যারা, গুঞ্জন করছিল যারা—সকলেই দৌড়তে দৌড়তে এসে বসে পড়েছে আবার।

একি সম্মোহন একি আকর্ষণ! একি মধুর কণ্ঠ! স্বর্গের কোন কিন্নরী এসে গাইছে বুঝি! টেবিল হারমোনিয়ামের প্রতিটি রিডে সুরশ্রুতির সুন্দর আঙুল সুরের ঢেউ তুলে তুলে যাচ্ছে আর আসছে। আসছে আর যাচ্ছে। ওপর থেকে নীচে। নীচে থেকে ওপরে। সঙ্গে গলার কি কাজ! বাজনার সুর আর গলা এক হয়ে মিলে যাচ্ছে। কোনটা গলা কোনটা বাজনা বোঝা যাচ্ছে না।

সকলের চোখে ঘুম মনে ঘুম। নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে বুঝি! কে কোথায় এসেছে কেন এসেছে সব ভুলে যাচ্ছে। এ যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়ার গান।

মনে হচ্ছে সুরশ্রুতি বলে কোনো মানুষ নেই, গানে গানে তৈরি সংগীত-সরস্বতী!

সুরশ্রুতিও নিজের গানের মধ্যে নিজে ডুবে যাচ্ছে। কি তন্ময়! হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। ওকি কাউকে দেখছে সত্যি সত্যি! তা না হোলে মানুষের মনের চোখের সামনেও অজানা কেউ এসে দাঁড়াচ্ছে কেন?

গানের কথা হাওয়ায় দুলে দুলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সুরশ্রুতি গাইছে।—

দেখা দিলে না কেন মোর নয়নে
এলে গোপনে সখা স্বপনে।
গহিন ঘুমের ঘোরে।
ভাঙাতে এলে নিশিভোরে
জাগিয়ে দেখিনু নেই—
মোর জাগরণে।

এই অবধি স্বর্গের আবহাওয়া বয়ে গেছে।

এক নিমেষে বদলে গেল।

সুরশ্রুতি বলছে খুব মিহি গলায়।—কে! সত্যিই তুমি কি এসেছ? তুমি কি সেই মানুষ!

সুর! কি বলছ তুমি? কাকে খুঁজছ? আমি—আমি সুলভ।

কে—কে? বুঝতে পারছি না শুনতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি না মোটেই।

টেবিল হারমোনিয়ামের রিডের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুরশ্রুতি।—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না যে!

সুরশ্রুতিকে চেয়ার থেকে ধরে তুলেছে সুলভ।—ভয় কি! আমি রয়েছি, কোনো ভয় নেই তোমার।

বন্ধুবান্ধবরা যারা এসেছে, এতক্ষণ মগ্ন হয়ে গান শুনেছে, সকলের ধ্যান-ভঙ্গ। কি হয়েছে বৌদি, কি হয়েছে মিসেসের? কি হয়েছে কি হয়েছে?

সুরশ্রুতিকে সকলে মিলে গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে।

আমি কোথায়! বলেই সুরশ্রুতির মাথাটা লুটিয়ে পড়েছে পাশে দাঁড়ানো সুলভের বুকের ওপর।

পাঁজাকোলা ক'রে সুলভ নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছে সুরশ্রুতিকে। আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। কাছে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। কি পবিত্র! কি সুন্দর!

চোখ ফেরানো যায় না, মন সরানো যায় না।

বন্ধুদের মুখ শুকনো।—খবর দিস, আবার আসব।

এক এক ক'রে চলে গেছে সবাই।

সুলভ দেখছে শরতের মেঘমুক্ত আকাশে টলটলে নীল। জ্যোৎস্নাঝরা মিষ্টি মুখ একখানি।

সুলভ কি দেখেছে সুরশ্রুতিকে কি ভেবেছে অন্য পাঁচজনের তাতে কিছু যায় আসে না। তারা সুলভ-সুরশ্রুতিকে মোটেই ভালো চোখে দেখতে পারবে না। ভালো মনে ওদের আচার ব্যবহার মেনে নিতে পারবে না! একে অন্যের গা টেপাটেপি করেছে। মুচকি হেসেছে। চোখের ইশারা, হাসির ধমক চাপতে শাড়ির আঁচল মুখে।

ঘর ফাঁকা হতে শুরু করেছে।

এমনি নীরবে যায় নি কেউ কেউ। ওদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যেতে যেতে বিদ্রূপ আর টিকাটিপ্পনী করতেও ছেড়ে দেয় নি।

নাটক নাটক। এমন নাটক কেউ দেখেছে কিনা, কে জানে! হবে বা! ভাগ্যগুণে এসব দেখা যায়। তাদের সৌভাগ্য বলেই দেখতে পেল।

অভিনয় অভিনয়। অভিনয়ের একটা মাত্রা আছে। এ অভিনয় ছাড়িয়ে গেছে সেকাল-একালের নাট্য সম্রাজ্ঞীদেরও। চেনা মানুষকে চিনতে পারলেন না উনি। নিজের স্বামী অচেনা হয়ে গেল। লজ্জা লজ্জা! কি কেলেঙ্কারি! উনি নাকি কাউকে দেখতে পেলেন না! চোখ থাকতে চোখের মাথা খাওয়ার ঢং। অন্ধ সাজতে হলো সুলভের বুকে পড়বার জন্যে। ছ্যা ছ্যা ছ্যা। বনেদী বাড়ির নাম ডুবতে আর বাকি কি রইল! নিশ্চয় কেউ না কেউ ছিল নাগর আগে। গানের ঘোরে মুখ দিয়ে সেই কথাই বেরিয়ে এসেছে।— তুমি কি সেই মানুষ!

কার আর বুঝতে বাকি ও মেয়ে সহজ নয়। ও মেয়ে মোটেই ভালো নয়। সুলভ টাকে এমন বেশ করে নিয়েছে যে, ওর বিষয়ে কালো বোবা অন্ধ।

একেবারে নিজের অস্তিত্ব হারানো যাকে বলে। এসব অনাসৃষ্টি আর অনাচার দেখতে এ বাড়িতে আর না আসাই ভালো।

দরজার গোড়ায় চোখ বুজে বসে গান শুনেছে রহলা। এখন রহলাও সুযোগ পেয়ে গেছে তার হাতিয়ার তৈরি করবার জন্যে। ভালো করে শান দিয়ে নিতে হবে। মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে উঠে পড়েছে। ওর অভ্যেস মতো বানানো ছড়ার গান গাইতে থেমে যায় নি। গেয়েছে।

চেনেনা আপনজনে,
মন আছে বিদেশি মনে।

দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গান শুনেছে পুষ্পকলিও। চাপা গলায় ধমক দিয়েছে রহলাকে।

বড় বাড়াবাড়ি করছিস রহলা। একটা নির্দোষ মেয়ে, তার দোষ ধরবার জন্যে তোর এত মাতামাতি কেন?

হ্যাঁ, নির্দোষ! তোমার সর্বনাশ করেছে, সে নির্দোষ।

ওর কোনো দোষ নেই। ও কিছুই জানত না আমার কথা। আমার ব্যাপারে আমি বুঝব। তোকে নাক গলাতে হবে না অত।

হিঁ হিঁ করে কান্না শুরু হলো রহলার।

চুপ্ কর! ছিঁচকাদুনি কোথাকার! ওকে তাড়াবার চেষ্টা করছিস কেন ওর পেছনে লেগে লেগে? ওকে তাড়াতে গিয়ে তুই আমাকেই তাড়াবি আগে এ বাড়ি থেকে। বিষাক্ত করে দিয়েছে বাড়ির হাওয়া। আরও বিষাক্ত করে তুলছে মরণ হলে বাঁচি।

নাকি সুরে কেঁদে কেঁদে বলেছে রহলা।

বৌদি গো অমন কথা বলুনি,
তোমার রহলা রানী বাঁচবেনি।

পুষ্পকলি দ্রুতপায়ে চলে গেছে ওখান থেকে।

গিন্নিমা সুলভকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছে।

কথা হাওয়ায় হেঁটে বেড়ায়। এটা মনে রেখ। শুনে শুনে কান ঝালাপালা। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না সব সময়। আমি জানি, আমার আদরেতেই আজ তোমার এ দুঃসাহস। তোমাকে বাঁচাতে কর্তার কাছে আমি নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছি। আর পারছিনে। মানুষের সহ্যের ধৈর্যের একটা সীমা থাকে। লোকের মন বোঝ না? মনের ব্যাপার নিয়ে তো যথেষ্ট পড়াশোনা করেছ। ছেলেদের শিক্ষক হয়েছ। খেয়ালখুশি মতো অবুঝপনা করা তোমার সাজে না। এ বংশ যতই আজকালকার হোক, সেকেলে রক্ত এখনও তোমার বাবার গায়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি চাই না সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক। নতুন বৌয়ের আচার-ব্যবহারে মনে হয় নিশ্চয় ও মনের রুগী। ওর মনকে ঠিক করবার দায়িত্ব তোমার। বংশের মান-সম্মান রাখার দায়িত্ব তোমার। আমার মনে হয় দিন কতকের জন্যে নতুন বৌমাকে ওর মায়ের কাছে রেখে দেয়াই ভালো।

মাথা নত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সুলভ।

সুরশ্রুতি মায়ের কাছে যেতে চায় নি একদম।

সুলভ! সকলে ভুল বুঝুক। তুমি যেন কখনও আমাকে ভুল বুঝো না। আমি সইতে পারব না।

আমি ফিরে গেলে মা ভেঙে পড়বে। খুব কষ্ট পাবে। আমার জীবনের আগেকার কাহিনী মায়ের চোখে আবার ভেসে উঠবে নতুন করে। আমি চাই না তোমাকে ছেড়ে যেতে। সুলভ।

নিজেকে চেপে রাখতে পারে নি সুরশ্রুতি। চোখের জল সামলাতে পারে নি। চোখ উপচে দু'গাল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়েছে।

সুলভের চোখের কোণো জলের কণা টলটল করছে। গলা ধরে এসেছে।—সুর,

তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি সব শুনেছি। আমি কখনও কোনদিন তোমাকে ভুল বুঝব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কোনো ভয় নেই, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব যেমন তেমনি নিয়েও আসব। ছেড়ে আসার কথাই ওঠে না।

সুরশ্রুতির চোখের জল ওরই শাড়ির আঁচলে মুছে দিতে দিতে নিজেই হাপুস নয়নে কেঁদে সারা সুলভ।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে সুরশ্রুতির আকুল কান্না। নিজেরই চোখ মোছা আঁচলে সুলভের চোখের জল মুছে দিয়েছে সুরশ্রুতি—অতি সন্তর্পণে।

ক'দিনই বা হয়েছে। সবেমাত্র তো দিন সাতেক। এরই মধ্যে ও বাড়ির অনেক পট পরিবর্তন। সুরশ্রুতির আর সুলভের অবর্তমানে যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছে রহলা। এখানে রহলারই প্রধান ভূমিকা।

তন্ন-তন্ন করে সুরশ্রুতির বাক্স-প্যাটরা বিছানা টেবিলের ডেস্ক খুঁজে খুঁজে অনেক কিছু অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে।

রহলা মহাখুশি। তার উদ্দেশ্য চেষ্টা সাধনা সিদ্ধি।

অনেক গোপন তথ্য।

যেসব সুরশ্রুতির অস্বীকার করবার কোনো উপায়ই নেই। কোনো অজুহাতেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার কোনো পথই নেই। এ বাড়ি থেকে ওর বেরিয়ে যাবার মোক্ষম মারণাস্ত্র এ সব।

বারবার কপালে হাত ঠেকিয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়েছে রহলা।

ছবির পর ছবি। কোন নাগরের কোন পুরুষের এ ছবি! সুরশ্রুতির নিজের হাতে আঁকা, তলায় নিজের নাম লেখা। কত না যত্ন করে এঁকেছে। সুন্দর রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। একেবারে জীবন্ত। কি চোখ কি নাক কি ঠোঁট? একদম রাজপুত্তুর। একটা আধটা নাকি, পাতার পর পাতা। একই মানুষেরই ছবি।

গাইতে গাইতে ঐ যে বৌদির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কথা—'তুমি কি সেই মানুষ!' সেটারই সত্যি প্রমাণ এই ছবির মানুষ।

রহলা ছাড়া এমন হাতে নাতে ধরতে কেউ আর পারবে না কখনও।

বাড়িময় সুরশ্রুতির আঁকা ছবির খাতা দেখিয়ে দেখিয়ে বেরিয়েছে প্রত্যেকের কানে মনে বিষ ঢেলেছে। যে-সে বিষ নয়, সেঁকো বিষ। এ বিষে বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

জিনিসটাকে নিয়ে এতো হই হই করতে পুষ্পকলি অনেক নিষেধ করেছে রহলাকে। কানে কথা নেয় নি। বৌদির পথের কাঁটাকে চিরদিনের জন্যে নির্মূল করবার দৃঢ়পণ রহলার।

বারবার একই কথা শুনলে বিশ্বাসের বাঁধন শক্ত থাকা অসম্ভব। ঢিলে হয়ে যেতে পারেই। এখানে তাই ঘটেছে। পুষ্পকলির মনেও সংশয়ের দোলা দুলেছে। গিন্নিমার মনেও। গিন্নিমা তো রেগে আগুন। ওরা এলে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে, সুরশ্রুতির স্থান এ বাড়িতে আর একদণ্ডও নয়। অনেক হয়েছে অনেক সয়েছে গিন্নিমা।

শাশুড়িমাকে অনুনয়—বিনয় করে পুষ্পকলি বলেছে, মা সত্যিই যদি আগের জীবনে সুরের কিছু হয়ে থাকে, তার জন্যে তাকে সংশোধন করবার সুযোগ দিয়ে দেখা উচিত। কার মনে কখন কি যে হয়ে যায়, কে বলতে পারে! কুন্তীরও তো কুমারী অবস্থার কথা কে না জানে! তখনকার সমাজ তো কুন্তীকে ফেলে দেয় নি। পুষ্পকলির মনের ইচ্ছে একবারে কঠিন হাতে রায়ের ফর্মান জারি না করে সময় দেয়া হোক। যা সন্দেহ করা হচ্ছে। সেটার উত্তর চাওয়া হোক। দেখা যাক না ওটা কার ছবি। ছবি দেখে খারাপ ভাবাটা ভুল হবে। মারাত্মক ভুল হতেও পারে। প্রকৃত দোষীর সাজা হোক, দুঃখ নেই। একজন নির্দোষের বিনা বিচারে যদি সাজা হয়ে যায়, সেটা খুব দুঃখের। খুব অন্যায়। খুব অধর্ম। মহাপাপ। এ পাপ থেকে মুক্তি পাবে না কেউ।

যে ছবিটা নিয়ে এত তুলকালাম চলছে সে ছবিটা কোনো প্রিয়জনেরও হতে পারে। যেখানে খালি ব্যথা আর ব্যথা। না পাওয়ার ব্যথা। দুনিয়া ছেড়ে হারিয়ে যাবার ব্যথা। এও হতে পারে ছবির মানুষ এই পৃথিবীতে নেই আজ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে পুষ্পকলি। মনে পড়েছে নিজের ভায়ের কথা। অকালে হারানোর কথা। জলে ভরে উঠেছে দু'চোখ।

শাশুড়িমা এ সমস্ত জানেন। বেশি দিনের কথা নয়। বছর খানেক আগেই বৌমার ভাই একদিনের জ্বরে চলে গেছে। কোনো চিকিৎসা করাবার সুযোগও পায়নি। জানতে পারে নি কি কাল-অসুখ হয়েছিল।

আহা! কি ভালোই না ছিল। বাঁচার বড় হবার কত না সাধ। আজও বিধবা বৌ নীরবে নিরালায় চোখের জল মুছে চলেছে।

শাশুড়িমায়ের দু'চোখের কোণ লাল হয়ে উঠেছে। পুষ্পকলির পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু স্বরে বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক বৌমা। কোনো অবিচার হবে না নতুন বৌমার ওপর। আমি থাকতে নয়ই। তাতে আমাকেও যদি এ বাড়ি ছাড়তে হয়, আমি প্রস্তুত। সম্পূর্ণ তৈরি আমি। জেনে রেখো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে আমার। আমি কোনো অন্যায় বরদাস্ত করব না। কোনো মতেই না।

পুষ্পকলি শাশুড়িমাকে প্রধান করেছে। চোখের জলে ভিজে গেছে শাশুড়িমায়ের দু'পা। বুকে টেনে নিয়েছে শাশুড়িমা পুষ্পকলিকে।—বৌমা, তুমি দেবী। কত

বড় মন হলে তবে এমন হতে পারে। এমন কথা বলতে পারে নিজের সতীনকে নিয়ে। কত উদার! সুলভের শান্তি সুখের জন্যে কত না ত্যাগ! তোমায় চিনতে পারা দায় বৌমা! রহলাটা শুধু তোমার ব্যাথার জায়গায় আঘাত করেছে। অবোধ, বোঝে নি।

রহলা বৌদির কান্নায় নিজেও কেঁদে সারা। নিজেই ঘুরে ফিরে বৌদিকেই আঘাত করে ফেলেছে সে নিজের অজান্তে। ভালো করতেই তো চেয়েছে। এ যে বিপরীত ফল ফলল।

সতীনের কাছে পাঠায় না বরে।
পাঠায় যমের ঘরে।

বৌদির বেলায় সবই উল্টো দেখছে সে।

সতীনের কাছে পাঠায় বরে
নিজে যায় যমের ঘরে।

মন থেকে রহলা শাশুড়িমা আর বৌদির মনোভাব মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। মেনে নেবে না সে কখনও। একটা এসপার ওসপার ক'রে তবে ছাড়বে।

দেখা যাক, নতুন বৌদি কি উত্তর দেয় ছবির ব্যাপারে। নতুন বৌদি নিশ্চয় বশীকরণ জনে। ওর দু'চোখ আর ভাবগতিক আর অভিনয় মানুষকে ভুলিয়ে দেয়। মায়াবিনী বৌদিকেও এমন বশ করে রেখেছে যে কিছুতেই বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। নিজের সর্বনাশ নিজে করে চলেছে। কালনাগিনীকে দুধকলা দিয়ে পুষে রেখেছে, পুষে রাখতেও চাইছে। সর্বনাশ কি এমন করে পুষে রাখে গা!

চোখ খুলবে। বাড়ির সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে রহলা। রহলা ছাড়বার পাত্রী নয় হেরে যাবার পাত্রী নয়। গাঁসুদ্ধু লোকের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেশ ছেড়ে এসেছে। গাঁয়ের লোকের মধ্যে কে না চেনে তাকে! এখনও কখনও সখনও দেশে গেলে পর ছেলে বুড়ো দূর থেকে দেখলে পালিয়ে যায়। ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপে। রহলা মিথ্যে বলতে জানে না মিথ্যে বলতে শেখেনি। সত্যি নিয়ে চলে বলে কারো বুকের পাটা হয় না সামনে এসে মোকাবিলা করবার।

রহলা নিজের মনে নিজের পথেই চলবে।

বৌদির উপকার করতে গিয়ে যদি অপবাদ আসে আসুক। তার কোনো ভয়ডর নেই। ভগবানকেই সে যখন তখন গালাগালি করে। মানে না। আর মানুষকে! তার কাছে মানুষ একটা পিঁপড়ে।

নিজর মনে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরেব দরজায় গিয়ে হাজির রহলা।

ভামিনী রকে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। ভেতর থেকে বামুনঠাকুর চিৎকার করছে, ভামিনী। শিগগির শিগগির। খোকাবাবুরা ইস্কুলে যাবে এক্ষুণি। আলুভাজা

না হোলে ওদের আবার মুখে রোচে না অন্যকিছু। খাবে না, থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কি রাগ! অমন ঠাণ্ডা মা বাপ, তাদের এমন ছেলে! মা বাপের মুখে কথা সরে না। দুই ছেলের মুখে কি ভাষা! আট-নয়েই এই! বড় হ'লে না জানে কি হবে! দুষ্টু বলে দুষ্টু! কিছু বলবার উপায় আছে। বললেই চড় লাথি কিল, চুল ধরে টানাটানি। ওদের হাতে মুঠোয় তো ঠাকুরের অর্ধেক চুল উঠে গেছে। এত দুরন্ত এত অবাধ্য যে কিছুতেই কারোর কোনো কথা শুনবে না, কারো কথা মানবে না। লাটসাহেব এসেছে সব। সাপের পাঁচ-পা দেখেছে।

কাজ ছেড়ে কতবার চলে যেতে চেয়েছে। —বৌদি, আমায় বিদেয় দাও। 'বিদেয়' শুনেই বৌদির চোখে জল।

ঠাকুরের হয়েছে যত জ্বালা—না পারে থাকতে না পারে যেতে। কপালের লেখা বুঝি এখানেই মরণ তার।

কোমরে দু'হাত দিয়ে ঠমকে ঠমকে চলছে রহলা। রকের এ মোড় থেকে ও মোড়! ঠাকুর। কি এত পাগলের মতো বকছিস! বিড় বিড় করে।

বেশি বকলে দাঁত ভাঙব
না শুনলে ঘাড় মটকাব।

এতক্ষণ ভামিনী চুপ করে ছিল। উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত নেড়ে নেড়ে রহলাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছে।—

এত সাহস হলো তোর
ঘাড় মটকাবি ঠাকুরের।
চলে যা দেশে ফিরে
মেয়ে তুই পগারে

রহলা ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও তিনবার হাততালি দিয়ে তিনপাক ঘুরে নিয়ে সামনে ঝুঁকে পরে নাচতে নাচতে বলেছে।—

আগে ছিলি জলার পেত্নী
ম'রে হলি শাকচুন্নি।
ভূতের ওঝা আসছে তেড়ে
তাড়াবে তোকে সর্ষে পড়ে।

ভামিনী কাজের মেয়ে। নিয়ম করে নিজের কাজ ক'রে যায়। কাজে কোনো খামতি নেই। তাই কারো কথা সইতে পারে না। মালিকরা কিছু বললে ছেড়ে কথা কয় না। আর রহলা? ওতো একটা চুনোপুঁটি। ওর কথা মুখ বুজে সয়ে যাবে! তার বংশে কেউ সহ্য করে নি কোনোদিন। ভামিনীর বাবা কবি গান গেয়ে বেড়াত। বাবার

ধারা পেয়েছে ও। মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারে। উত্তর দিতে পেছপা নয় ভামিনী। রহলার বাবাও কবিগান করত। যে তুলনায় রহলা কিছু নয়।ওটা একাট আস্ত শয়তান।

ভামিনী ছাড়বে কেন ওকে! বুড়ি হয়েছে তো কি হয়েছে! এখনো গলা সপ্তমে চড়ে। এখনো গলার জোর কি! ভাঙে না, ধরে না।

যারা শোনে। সকলের কি সুখ্যাতি! একটুও বেসুরো নয়। রহলা কোনদিন সমান হতে পারবে না।

গলায় সুরের বালাই নেই। ভাঙা কাঁসরের মতো খনখনে আওয়াজ। তার ওপর নাচের ভাবভঙ্গি কি বিচ্ছিরি? যাচ্ছেতাই। ও তো কুড়িতে বুড়ি হয়ে গেছে। ভামিনী বুড়িতে কুড়ি। লোকে বলে চেহারা বাঁধন কি!

এবারে ভামিনী দুলে দুলে সামনে পেছনে হেলে দুলে নাচ শুরু করে দিয়েছে। একবার সামনে মাথা ঝুঁকে পড়ছে। আবার পেছন দিকে হেলে পড়ে সিধে হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে হাততালি আর পা ঠোকার আওয়াজ তালে তালে।

বামুন ঠাকুর তেলের কড়া নামিয়ে রেখে হাঁ করে দেখছে। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখারই মতো বটে।

যে কোনো লোক এসে পড়লে, তাকে একটু দাঁড়িয়ে দেখতে হবেই। ছেলেবুড়ো যে বয়েসেরই হোক না কেন। বামুন ঠাকুরের দেখার মধ্যে এমন কি বা নতুনত্ব। তবে রান্না ফেলে দেখা, এই যা।

ভামিনী ডান হাতে কান চেপে ছড়ার গান ধরেছে।—

রহলা ডাইনি
সর্ব্বনাশী কালসাপিনী।
লোকের সুখে হিংসেয় মরে
বুকে-মাথায় জ্বালা ধরে।
মরি হায় হায় হায়
রূপ দেখে বর ছুটে পালায়।
বিয়ের বয়েস হলো কাবার
এ জন্মে হবে না আর
তাইতে তোর মনের বিকার।
মরি কি রূপের বাহার।
চোখে কালি মুখে কালি
কলঙ্কের কালি গুলে খেলি
তোর কি হবে উপায়!

দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখেছে পুষ্পকলি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে তরতর করে। রান্নাঘরের রকে এসে বেশ গম্ভীর গলায় বলেছে, গলায় রাগ না থাকলেও রাগ রাগ ভাবটা ফুটে উঠছে স্পষ্ট।—তোরা ভেবেছিস কি বলত? সকাল বেলায় তরজা শুরু করে দিয়েছিস দেখছি। তরজা যদি করতেই হয়, মাঠে-ময়দানে চলে যা। নিজেদের যা খুশি, যখন তখন তাই করছিস। সহ্য করা যায় কত আর বিদায় হয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দে।

বামুনঠাকুরের দিকে চেয়ে বলেছে, আচ্ছা ঠাকুর, তুমিও কি তেমনি! কি হাঁ করে দেখছ এত রান্নাবান্না ফেলে দিয়ে? বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ দেখছি! ওদের বেহায়াপনা দিনরাত্তির দেখছ, তবুও দেখার সাধ কি মিটছে না তোমার? ছেলে দুটো ইস্কুলে যাবে সেটাও খেয়াল নেই!

এ বাড়িতে বলার কেউ নেই বলে, সব পেয়ে বসেছে। এ বাড়ি বলেই সব টিকে আছে। অন্য বাড়ি হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

বৌদি বড় একটা বকে না কাউকে। বৌদির রণং দেহী মূর্তি দেখে ভয়মেয়ে সামনে থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছে রহলা। ভামিনীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, ওরে! এখান থেকে পালিয়ে চলি চ। ভাবগতিক ভালো না। বৌদি ক্ষেপেছে। হবে নাই বা কেন বল। দাদার জন্যে মনে ব্যথা, তাইতো রহলার মাথা ব্যথা।

পুষ্পকলি আর পেরে উঠছে না।

অবসন্ন ক্লান্ত।

নিজের সঙ্গে লড়াই আর লড়াই। দিনের খাওয়া রাতের ঘুম চলে গেছে। একই চিন্তা কেবল। একটা চিন্তা মাথা কুরে কুরে খাচ্ছে তার। সুরশ্রুতি। কি করে কেমন ক'রে বাঁচান যায় ওকে।

সুরশ্রুতির কথা-বার্তায় আচার-ব্যবহারে ও নিজেকেই একটা রহস্যময়ী চরিত্র করে তুলেছে।

শাশুড়িমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুষ্পকলি যে ভিত গড়ে তুলেছিল, সে ভিতে চিড় ধরছে। শাশুড়িমায়ের মন এখন সন্দেহের দোলায় দুলছে। কোন পথ বেছে নেবে,

ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

মহাফাঁপরে পড়েছে পুষ্পকলি।

সাতদিন বাদে ফেরার পর সুরশ্রুতিকে পাখি পড়ানোর মতো শিখিয়েছে বুঝিয়েছে। কিচ্ছু হলো না। চেষ্টা ব্যর্থ।

সুরশ্রুতির মুখে একই কথা। ছবির মানুষকে আমি চিনি না জানি না। আমি কেন আঁকি কখন আঁকি, তাও কিছু বুঝতে পারি না। সত্যি করে বলছি আমি। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস কর বললেই তো আর বিশ্বাস করা যায় না। না চিনলে না জানলে কেমন ক'রে আঁকা হয়। প্রশ্নটা ভালো করে বুঝে নিয়ে উত্তর দাও। এ সব গল্প কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সব খাতাতেই একই মানুষের ছবি। পাতার পর পাতা। না জেনে কেমন করে হয়? সত্যি গোপন করতে চেষ্টা কোর না। একটা সত্যিকে লুকোতে গেলে দশটা মিথ্যের আশ্রয় এসে পড়ে। তাতে বিশ্বাস আনতে পারবে না।

লোকে বলবে, তুমি মিথ্যে তোমার সব কিছু মিথ্যে। যদি কোনো আপনজন প্রিয়জন হয়, হলেও হোতে পারে। অসম্ভব নয়। শাশুড়িমা সেটা বোঝে। অবুঝ নয়। তোমাকে বাঁচাবার জন্য যারা চেষ্টা করছে, অন্তত তাদের কাছে তুমি নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে, খুলে বল। মানুষের জীবনে ভুল-ভ্রান্তি হয়েই থাকে। সেটা দোষের নয়। সেটা অপরাধ নয়। অজ্ঞান অবস্থায় অনেকেরই জীবনে অমন ঘটনা ঘটে।

ঠিক ঠিক, বলে যাও। শাশুড়িমায়ের গলার স্বরে বিরক্তি!

সুরশ্রুতির ঘুম ঘুম চোখে যেন কি একটা দৃশ্য আসছে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে আসছে। মনে করতে চেষ্টা করছে।

নিস্তব্ধ ঘর।

সোফা কোচে তিনজন মাত্র বসে আছে। 'কি হয় কি হয়'—দু'জনের মনে আলোড়ন তুলছে ঘন ঘন, সুলভের আর পুষ্পকলির। ওদের মুখে-চোখে আকাশপ্রমাণ দুশ্চিন্তা।

সুরশ্রুতি কি বুঝি দেখছে। নিজের অগোচরেই বলছে।—

অনেক দূর থেকে ওর গলার স্বর ভেসে ভেসে আসছে।

একা নাগাড়ে নয়। থেমে থেমে।

আমার খুব ভালো লাগছে মানুষটিকে। চেনা না অচেনা, বুঝতে পারছি না। দেখছি তো দেখছিই। ও আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ ফেরাচ্ছে না। কুতুব মিনার আর লোহার মিনার, দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। লোহার মিনারের কাছে ওই মানুষ? সঙ্গে একজন সন্ন্যাসিনী। সুন্দর করে বুঝিয়ে বলছে, আজ থেকে ষোলশ বছর আগের

এই মিনার। তখনকার লোকের ভেতরের সঙ্গে বাইরের খুব মিল থাকত। কাজে-কর্মে কথাবার্তায়। মুখ মন এক। তফাৎ নয়। মনে ভেজাল রাখত না বেশির ভাগ লোক। ভেজাল ছিল না বলেই এমন ভাবে এই মিনারটা তৈরি করেছে যে, এরমধ্যেও এমন কিছু ভেজাল রাখেনি যাতে নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। এখন কি হচ্ছে এর পরেও কি হবে, সে প্রশ্নে না গিয়ে, এই দীর্ঘ আয়ু পাওয়ার প্রশংসা করতে হয়। যাদের মাথা থেকে এই দীর্ঘ আয়ুর সৃষ্টি, তাদের প্রণাম। সন্ন্যাসিনী আর সেই মানুষ লোহার মিনারের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নিজেদের কপালে ঠেকিয়েছে বারবার।

এ দৃশ্য সুরশ্রুতি ভুলতে পারে নি। কি ভাবে মনে বসে গেছে জানে না। ওই মানুষ তার কাছে স্বপ্ন।

সুরশ্রুতি আর কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে নি। শুধু ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছে। দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে সোফার ওপর। অঘোরে ঘুম।

সত্যি না অভিনয়!

সুরশ্রুতি যা বলেছে, সবই এড়িয়ে যাওয়া পাশ কাটিয়ে যাওয়া। কোনটাই ঠিক ঠিক নয়।

বিশ্বাস করা শক্ত ছেলেমানুষি মনগড়া কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। সংসারী হোক অসংসারী হোক—যার মাথায় এতটুকু বুদ্ধি আছে।

ওকি ভাবে সবাই বোকা! যা বোঝাবে নির্দ্বিধায়। বুঝে যাবে—মেনে নেবে! না না না। শাশুড়ি মা গুম হয়ে বসে আছে। কোনো আলোচনা নয় আর কারো সঙ্গে।

ঘরের বাতাস থমথমে।

খুব আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ছে সুলভের জোরে। পুষ্পকলির জোরে।

ফয়সালা যা হবে। শাশুড়িমা কোন পথ বেছে নিতে পারে, চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে দু'জনের।

দৃঢ় চিত্তের মানুষ শাশুড়িমা। পুষ্পকলির ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ঝড় ঝড় ঝড়। হেরে গেল সে। সুরশ্রুতিকে এ বাড়িতে স্থান দিতে পারবে না বুঝি আর কোনো প্রকারে। এ বাড়িতে শাশুড়িমায়ের সিদ্ধান্তই একমাত্র সিদ্ধান্ত। কারো কোনো কথা একদম চলবে না। স্বয়ং ভগবান এসেও কিচ্ছু করতে পারবে না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে পুষ্পকলি।

বিয়ের পর এই দশ বছরে সুলভকে ভালো করেই চিনেছে। নিপাট ভালো মানুষ। ওর ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই নির্মল নির্ভেজাল।

এত যদি ভালো সুলভ, তাকে না জানিয়ে সুরশ্রুতির মতো একটা অভিনেত্রী মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসেছে কেন? এই নাকি ভালোর লক্ষণ!

যারা জানে না সুলভকে তারাই একথা বলতে পারে। জীবন থাকতে পুষ্পকলি বলতে পারবে না। পারবে না।

স্বপ্নের মানুষ সুলভ।

বরাবরই ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ওটা ওর মনের খোরাক। আলাদা একটা দিক। পুষ্পকলির মধ্যে ওর মানস-সঙ্গিনী, স্বপ্নের মেয়েকে খুঁজে পায় নি। পেয়েছে ভালো স্ত্রী। অনুরাগিনী অনুগামিনী সংসারী, তার দুটি সন্তানের জননী। সুখন ও শোভনের।

স্ত্রী পুত্রের ওপর কোনো কর্তব্যের ত্রুটি করে নি কোনদিন।

পুষ্পকলি মনেপ্রাণে চেয়েছে দেবতায় কাছে প্রার্থনা করেছে—মানুষটার মনের শূন্য জায়গা পূরণ করে দাও। ও যে স্বপ্ন দেখে, পূর্ণ কর।

দেবতারা বোধহয় স্বকর্ণে শুনেছে তার প্রার্থনা। এসেছে ঘরে সুরশ্রুতি।

সুরশ্রুতিকে তার হাতে সঁপে দিতে, প্রথমে একটু ধাক্কা খেয়েছে পুষ্পকলি। সুলভের মনের বাইরে হয়ে যাবে বা হয়েছে। সেটা সামান্য সময়। সুরশ্রুতির জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে।

এ যে জলভরা স্বপ্ন মাখা চোখ। এ যে স্বপ্নের মেয়ে। মাঝে মাঝে মনমরা সুলভ এ মেয়েকে নিয়ে এবারে শান্তি পাবে নিশ্চয়।

আনন্দে সুরশ্রুতিকে বুকে চেপে ধরেছে পুষ্পকলি। নিজের গয়নায় সাজিয়ে দিয়েছে ওকে বিয়ের কনের সাজে।

একদিনের কনের সাজের মেয়েকে বোধহয় শাশুড়িমায়ের নির্দয় রায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

পুষ্পকলি বেশ বুঝতে পেরেছে সুরশ্রুতিকে ধরে না রাখতে পারলে সুলভকেও রাখা যাবে না।

পুষ্পকলির চোখের সামনে অন্ধকার। চতুর্দিকেও। দেওয়াল ধরে ধরে শাশুড়িমায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে আস্তে আস্তে।

ঘুম ভাঙছে সুরশ্রুতির। ভাঙল। সুলভ সোফা থেকে ধরে তুলেছে ওকে।

দু'জনে গিন্নিমায়ের পায়ের কাছে এসে প্রণাম করেছে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গিন্নিমা।

একটু আগে এত মিথ্যের ফিরিস্তি দিয়ে গেছে এই মেয়ে কি! ভাবতেও অবাক লাগে। এর নিরীহ নির্বিকার মেয়ের অভিনয় করা কি সম্ভব! গোপন প্রমাণ লোপের

চেষ্টা করা কি এর পক্ষে সম্ভব!

চোখ ফেরাতে পারছে না গিন্নিমা। সুরশ্রুতির চোখের তারা বুঝি বলছে গিন্নিমাকে, সে নির্দোষ। নির্দোষ। নির্দোষ।

আশ্চর্য!

গিন্নীমায়ের মাথা কি রকম গুলিয়ে যাচ্ছে।

ওর ওপর কোনো দেবতা-অপদেবতা ভর করে নাকি? আগের মেয়ে একদম নয়। এ মেয়ে সম্পূর্ণ অন্য। চোখকে কি ক'রে অবিশ্বাস করবে গিন্নিমা। বয়েস হয়ে গেলেও চোখের জ্যোতি এখনও খুব। আগে যে সব কথা শুনেছে। সে সব কার কথা! কানকেই বা অবিশ্বাস করে কি করে!

কোন রাস্তায় যাবে শাশুড়িমা! হে ভগবান! তুমি বলে দাও, তুমি ব্যবস্থা করে দাও!

একটা কিছু নিজের মতে করে বসে অপরাধী না হ'য়ে পড়ে শেষে। রক্ষে কর!

সুরশ্রুতির শরীর থরথর ক'রে কাঁপছে। শাশুড়িমায়ের পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

ধরা গলায় শাশুড়িমা বলেছে, নতুন বৌমা! ওঠো মা!

দু'হাতে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। স্নেহের পরশ।

আবার ঘুম। বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সুরশ্রুতি।

এ যে বাচ্চা একেবারে! নির্দোষ শিশুর মুখ, পবিত্র শিশুর ঘুম।

গিন্নিমায়ের মেয়ে নেই। মেয়ের বড় সাধ ছিল। সে সাধ আজ পূর্ণ করে দিয়েছে ঈশ্বর! মনে হচ্ছে তো তাই! অশেষ করুণা।

এতসব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন দেখছে শুনছে। তার অভ্যেসই আড়ালে-আবডালে কান পেতে চোখ রেখে শোনা আর দেখা।

সে আর কেউ নয়। রহলা।

শাশুড়ি মায়ের নরমভাব মোটেই ভালো লাগে নি রহলার। নতুন বৌদি বাড়িতে থেকে গেলে কোনো দিনই শান্তি ফিরে আসবে না বৌদির মনে। রহলা মনে মনে ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে।

কোন পথে যাওয়া যায়। কোনোমতে চলা যায়।

নতুন বৌদি অনেক রকমই জানে। সকলকে ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে। 'হ্যাঁ কে' না করাচ্ছে, 'না কে' হ্যাঁ। বাপরে বাপ্! দিনকে রাত রাতকে দিন। কি সর্বনেশে চোখ! তাকালে সব ভুলিয়ে দেয় গা! জিনিসটা শেষ হয়ে এসেছিল। এ বাড়ি থেকে ওকে

বেরোতে হতোই। কেউ রুখতে পারত না। হঠাৎ এমন ভাবে গিন্নিমায়ের দিকে তাকাল সব ওলটপালট গা।

রহলা যে সে মেয়ে নয়। সবার চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়, রহলার চোখে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব। ওর চালাকি ওর চাতুরি ভাঙছে রহলা। শিগগিরই সকলকে ও বুঝিয়ে দেবে মায়াবিনীর আসল রূপ।

শান্তি তৃপ্তিতে বাড়িটা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছল। স্বাভাবিক। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া। একটা পুজো পুজো আমেজ। ভাদ্রের গুমোট চলে গেছে। শরতের মিষ্টি মেজাজ।

পুষ্পকলির মুখে হাসি চোখে হাসি বুকে হাসি। হেরে হেরেও সে জয়ী হয়েছে। তারই কথা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনেছে শাশুড়িমায়ের মন।

যতদিন আমি আছি ততদিন তুমি।

মনে হচ্ছে সুরশ্রুতির মহাফাঁড়া একটা কেটে গেল নিশ্চিন্ত।

একটা বিষয়ে সংশয় কিছুতেই যাচ্ছে না পুষ্পকলির। রহলার ওপর সন্দেহ। ও যেন কেমন পাগল পাগল। চাউনিটা পালটেছে। দুষ্টুবুদ্ধি তো ছিল আগেই, আরো দুষ্টুবুদ্ধি ওর মাথায় নাচানাচি করছে মনে হয়। ঘরে ঘরে উঁকিঝুঁকি মারার অভ্যেসটা ইদানীং দ্বিগুণ নয়, চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে।

এখন পুষ্পকলির নজর কেবল একমাত্র রহলার ওপরে। কোনদিক দিয়ে যে কি করে বসবে কে জানে! এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলে আরো কেলেঙ্কারী। বাইরে গিয়ে ঘোঁট পাকাবে আরো। ঘরেবাইরে আগুন জ্বলে উঠবে। টেকা দায় হয়ে দাঁড়াবে। ও মেয়ের কুষ্ঠিতে অসাধ্য কিছু নেই।

একটা ভয় বারে বারে ভেতরে খোঁচা মেরে চলেছে পুষ্পকলির।

রহলা কি প্রতিশোধ নিতে চাইছে? ওর ভেতরে কি প্রতিহিংসা জেগে উঠেছে!

চাইলে চাইতে পারে, জাগলে জাগতে পারে। বিশ্বাস নেই।

হ্যাঁ। ওর বিয়ে পণ্ড করে দিয়েছে পুষ্পকলি। বাধা দিয়েছে। করতে দেয় নি।

সেইজন্যেই সুখ-শান্তির নামে বিচ্ছেদ বাধাতে চাইছে সুলভের সঙ্গে তার নানারকম ঘটনা ঘটিয়ে?

পুষ্পকলির কোনো কথা কানে নিচ্ছে না। কোনো বারণ মানছে না। গণ্ডারের

গোঁ। নিজের গোঁয়েই চলেছে, বিপদ হচ্ছে এইখানে।

আচ্ছা, এসব ভাবছে কেন পুষ্পকলি!

পাশের বাড়িতে যে ছেলেটা মিথ্যে পরিচয়ে রান্নার ঠাকুর সেজে এসেছে, তার সঙ্গে রহলার কি দহরম মহরম। কি ঢলাঢলি কি গলাগলি!

এ বাড়ি থেকে খাবার দাবার নিয়ে গিয়ে ও বাড়িতে খাওয়ানো দাওয়ানো। কি যত্নআত্তি কি আদিখ্যেতা! পুষ্পকলি বকেছে। বারণ করেছে মেলামেশা করতে ছেলেটার সঙ্গে। রহলার মনঃপূত হয়নি। স্পষ্ট বলেছে স্বপ্ন দেখেছি ও আমার পূর্বজন্মের স্বামী। এ বিয়ে বন্ধ করবার কারো সাধ্য নেই। বিধাতার লেখা। বিধাতাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তা না হলে প্রথম দেখার পর ওকে এত ভালো লেগে গেছে কি করে! ওরও তো একই অবস্থা তাকে দেখে।

রহলার কথায় পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে পুষ্পকলির।

দেখ রহলা, বাড়াবাড়িটা একটু থামা। ছেলেটা মোটেই ভালো প্রকৃতির নয়। চাউনিটাও কেমন কেমন। আমার ভালো লাগে না মোটেই। আমি চাই না তোর কোনো বিপদ ঘটুক।

ঘটে ঘটুক। আমাকে নিয়ে কারো মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার ব্যাপারে আমিই আমার কর্তা। নিজে যা বুঝব তাই করব।

এরপর আর কিছু বলা যায় না। পুষ্পকলি নিজের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

কদিন যেতে না যেতে রহলা হাঁউমাঁউ ক'রে কেঁদে এসে পড়েছে।

বৌদি! সর্বনাশ হয়ে গেছে। বামুন ঠাকুরকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। ভালোমানুষের এই দশা। নিশ্চিন্তে পৃথিবীতে থাকবার উপায় নেই। ভগবান কি আছে? ভগবান চোখের মাথা খেয়েছে কানের মাথা খেয়েছে। কোনো ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা নেই। সে নিজেই কম জোর সে অন্যকে রক্ষে করবে কি ক'রে!

রহলা কপাল চাপড়েছে। বুকে ঘুষি মেরেছে। পুলিশের আদ্য শ্রাদ্ধ করেছে—আর কাউকে পেলে না গা! একটা নিরীহ মানুষকে ধরে টানাটানি।

দাঁতে দাঁত চেপে নিজের আঙুল মটকে চিৎকার করে বলেছে—ওই হাতে কুষ্ঠ হবে। খসে খসে পড়বে আঙুল, হাত। রহলার শাপ মিথ্যে হবে না মিথ্যে হবে না, নরলোকে দেখবে।

ডাকাত দলের লোক বলে প্রমাণ হয়েছে, ওই বামুন ঠাকুরের জেলও হয়ে গেছে। তবুও রহলার বিশ্বাস,—ওসব সাজানো। আসল লোককে আড়ালে রাখা, ভালোমানুকে ধরে জেলে পোরা।

বছর তিনেক বাদে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা। রহলার সঙ্গে দেখা।

এবারেও পুষ্পকলি না বলে থাকতে পারেনি। ওর অপমান গায়ে মাখেনি। বলেছে—দেখলি তো সব, জানলি তো সব আর কেন মেলামেশা! একটু বোঝ, একটু সাবধান হ।

রহলা নিজের পথেই চলেছে।

আবার হুলুস্থুল। আবার নাকি ছেলেটি ধরা পড়েছে। এবারে খুনের ঘটনায়।

রহলা খুব ভয় পেয়ে গেছে।

পুষ্পকলির কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বলেছে, বৌদি গো! তুমি যা যা বলেছে তাই তাই সত্যি হলো। আমার ভালোর জন্যই তুমি করেচ, একন বুঝেছি। একন রাগ নেই তোমার ওপর। হুঁ! কি বাঁচাই বেঁচে গেছি। খুব হয়েচে। আর বিয়ে দরকার নেই আমার, প্রথমটা তো বিয়ের পিঁড়ি থেকে পালাল। দ্বিতীয়টাকে পুলিশ ধরল। এবার—

তৃতীয় যে আসবে হেসে
রহলাকে জানে মারবে শেষে।

নাক ম'লে কান ম'লে বলেছে, নাকে কানে খত্। আর নয় আর নয়। রহলা ভুল করেও পা বাড়াচ্ছে না কোনদিন ওদিকে।

এটা তো ঠিক, রহলার মন শেষের দিকে বদলেছে। তবে কেন সে প্রতিশোধ জাগবে? কিসের প্রতিহিংসা! মিছিমিছি পুষ্পকলির এসব চিন্তা।

সব ঠিক। তবুও সংশয় যাচ্ছে না মন থেকে পুষ্পকলির। থেকে থেকে ভীষণ ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আর তা হচ্ছে সুরশ্রুতির ঘরেতে রহলার যাতায়াত নিয়ে, ইদানীং যাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা 'কি হয় কি হয়' আতঙ্ক!

টাটকা রজনীগন্ধার মালা হাতে নিয়ে হেলেদুলে হাসতে হাসতে সুরশ্রুতির ঘরে প্রবেশ করেছে রহলা।

সুরশ্রুতির জানলার আকাশে দৃষ্টি। চুপচাপ। একখানা দেবীপ্রতিমা।

নতুন বৌদি! ভারী সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে ভাই। তোমার জন্যে মালা নিয়ে এসেছি। খোঁপায় সাজাব। খুব ভালো লাগবে। ফুল তোমাকেই মানায়। যার যেখানে স্থান, সে সেখানে যান।

চুলের সঙ্গে মালাটা জড়িয়ে দিতে দিতে গা ছেড়ে গান ধরেছে।—

সইলো!
তোকে লাগে কেমন।
তোর চোখে চোখ আছে কিছু,
কি আছে এমন?

দূর থেকে কাছে ডাকে
কাছে এলে ধরে রাখে।
যে আসে তার হয়রে মরণ।
কত লোকে ঘুরে মরে
তোর চরণ পাবার তরে।
দিস না ধরা যারে তারে
না পেলে মনের মতন।

আচ্ছা নতুন বৌদি কত লোকই না তোমার জন্যে পাগল হয়েছে বল। এ চোখ এ রূপ! দেখে দেখে আশ মেটে না। ভোলা যায় না কি! তোর আঁকার ছবির মানুষটি কোথায় থাকে আমায় বলে দিলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব। কাকে বকে টের পাবে না। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না কেউ। আমার নিজের দিব্যি গেলে তোমাকে বলছি। তোমার কাছে আমার কথা কিছু গোপন নেই। ছেলেটা একেবারে সাক্ষাৎ কেষ্ট। পুকুরে চান করতে গেছি, সেখানে দাঁড়িয়ে। দুপুরে ভাত খেতে বসেছি, তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। রাত্তিরে ঘরে শুয়েছি, জানলা দিয়ে ঢিল পড়েছে গায়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে, পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি। ওই কেষ্টার জন্যে আমার মন কেমন করে। না দেখলে থাকতে পারি না। বাঁশি না শুনতে পেলে কেঁদে মরি। সে যে কি অবস্থা আমার, আর কত বলব।

আমি সব বুঝি আমার মতো তোমারও সেই অবস্থা। তুমি দিনরাত অত ভেবনা। তুমি জানবে রহলা তোমার সহায়।

তোমার মানুষটি কোথায়?

কাকস্য পরিবেদনা। যথা পূর্বং তথা পরং।

সুরশ্রুতি নিঝঝুম, নীরব। পাথর মূর্তি একখানা। শোনে না দেখেনা বলে না।

কথায় বলে বোবা-কালার শত্রু নেই। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সব ক্ষেত্রে খাটে না। যেমন সুরশ্রুতির ক্ষেত্রে। খাটেনি, খাটলো না।

রহলা সুরশ্রুতির অতীত জীবনের গোপন প্রেম কাহিনীর কিছুই হদিশ খুঁজে পায় নি। সুরশ্রুতিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে পেতেও। সব চেষ্টা বিফল। এক একটাতে পেছু হটতে হয়েছে। যত পেছু হটতে হয়েছে ততই জিদ-আক্রোশ বেড়ে উঠেছে রহলার। মরিয়া হয়ে পড়েছে এবার মরণ কামড়ের জন্যে।

এবারে সফল হয়েছে। যাকে বলে শিরে সর্পঘাত। তাগা বাঁধবে কোথায়!

গিন্নিমাকে চুপিসারে ডেকে নিয়ে এসে এসে নতুন বৌদির কীর্তিকলাপ দেখিয়েছে। শুদু দেখানো নয়, ভালো করে বুঝিয়ে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

গিন্নিমা! তুমি থাকতে এ বাড়িতে এ অনাচার! কত আর সহ্য করা যাক। দাদাবাবুর বন্ধুদের সঙ্গে কি ফষ্টিনষ্টি! কি হাসাহাসি। কি গায়ে পড়াপড়ি!

সুষমদা এলে তো কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে আরতির ডালা নিয়ে হাজির হবে সামনে। হাসিহাসি মুখে আরতি করবার ধুম কি! ছি ছি! বেহায়া বেশরম! দেখতে লজ্জা কইতে লজ্জা। চন্দনের টিপ কপালে পরানো, ডালা থেকে মিষ্টি তুলে মুখের মধ্যে পুরে দেয়া। এ কোন বাড়ির বৌ-ঝি করে! দিনের পরদিন এই কাণ্ড চলেছে।

জিজ্ঞেস করলে একই ভালোমানুষি ঢঙে একই কথা।—

কেন করি, কে করায়—বুঝি না কারো কাছে শিখি নি।

আচ্ছা বল গিন্নিমা একথা মেনে নিতে পারা যায়! তোমার উচিত বিচার—যা হয় একটা হেস্তনেস্ত কর।

এঁর পরের ঘটনা অতি নির্মম অতি মর্মান্তিক। বিনা মেঘে বজ্রপাত।

সুলভকে ডেকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছে গিন্নিমা—

এ বাড়িতে নতুন বৌমার স্থান হওয়া অসম্ভব। ওকে রাখা চলবে না মোটে। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

এ বাড়ির উপযুক্ত হ'য়ে আসতে পারে যদি, তখন যেন আসে। তার আগে এক মুহূর্তের জন্যেও নয়।

এ বংশের ধারার কথা নতুন বৌমাকে জানিয়ে দিও। তুমি জানো তোমার ছোট ঠাকুরমার কথা। কোথায় যে হারিয়ে গেল, কোন সময়ে যে গেল, কেউই আজও অবাধ কোনো সন্ধান দিতে পারে নি। হয়ত বা রাতের অন্ধকারে। কিনা ভোর থেকে তাকে বাড়িতে কেউ আর দেখে নি।

অপরাধ—ছেলের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে হাসাহাসি গল্পগুজব।

তোমার ঠাকুরদার চোখে এটা মস্ত অপরাধ। পরিষ্কার বলে দিয়েছে।—

বংশের মানসম্মান রাখতে যদি চাও, আমার ছেলেদের চোখের সামনে থেকে সরে যাও। ওদের জীবনে তোমার কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিও না। কোন পথ বেছে নেবে নিজেই স্থির কর। তোমার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে। অন্যে কেউ করবে না। ছেলেরা তো নয়ই। আমিও না। তুমি নিজে না পারলে অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতে হবে। সেটা যেন না হয়।

সুলভ স্পষ্ট বুঝেছে মা নিজের সিদ্ধান্তে অচল অটল।

কি করুণ দৃশ্য!

গোটা চোখের জলে ভেসেছে বাড়িটা খালি। বিশেষ করে সুলভ সুরশ্রুতির বিদায়ের সময়।

সুলভকে চলে যাওয়ার কথা একবারের জন্যেও মুখ খুলে বলেনি গিন্নিমা। কিন্তু সুলভ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুরশ্রুতি গেলে, সেও যাবে চিরদিনর মতো।

একথা শুনেও ছেলের ওপর গিন্নিমার কোনো সহানুভূতি আসে নি। বারণ করেনি সুলভকে।

এমন কি যাওয়ার সময় মুখের দিকে তাকায়ও নি। প্রণাম করবার জন্যে পায়ে হাত দিতে-ছুঁতেও দেয় নি। খাটের ওপর এক ভাবেই পেছু ফিরে বসে থেকেছে।

সুলভের 'মা' ডাকের জবাবে কোনো সাড়া বেরোয় নি গিন্নিমা মুখ দিয়ে।

ছোটভাই সুরভ এলে জড়িয়ে ধরেছে সুলভকে। চোখের পাতা ভেজা। মাকে বলেছে। অনেক অনুরোধ করেছে দাদাকে আটকে রাখবার জন্যে। কোনো ফল হয়নি। মা চুপ। ছোট-বৌমারও কাকুতি-মিনতি কানে আসে নি। দূরে দাঁড়িয়ে পুষ্পকলি।

কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর গলার স্বর একদম বন্ধ। রহলা যে এত বড় নিষ্ঠুর আঘাত দেবে ওকে, স্বপ্নের বাইরে। রহলা ভালো করার নামে কি সর্বনাশ তার করে ফেলেছে, ও বুঝি নিজেও বুঝতে পারছে না।

সুখন আর শোভন দুই ছেলেই বাবার কাছে ছুটে এসে দু'পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে আগলেছে। যেতে দেবে না সুলভকে। বাবা! আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না।

দু'চোখের জল উপচে পড়েছে সুলভের। ধরে রাখতে পারে নি। ছেলেদের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে কপালে চুমু খেয়েছে। ধরাগলায় ফিসফিস করে ওদের কানে কানে বলেছে, মায়ের কাছে যাও।

এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুষ্পকলি।

নড়ে নি সরেনি, একটা কাঠের পুতুল। সুখন শোভন এসে মায়ের বুকে আছড়ে পড়েছে।

দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে পুষ্পকলি দু'জনকে।

সুরশ্রুতির প্রণাম শাশুড়িমা নেয় নি। আকুল কান্নায় সুরশ্রুতির সারা দেহ কেঁপে উঠেছে। শ্বশুরমশাইও নেয়নি। চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ। শ্বশুরমশাইয়ের কোনো মতামতই চলবে না। শাশুড়িমায়ের রায়ই সর্বস্ব।

পায়ে পায়ে পুষ্পকলির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুরশ্রুতি।

নিচু হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে, জাপটে ধরেছে পুষ্পকলি সুরশ্রুতিকে। সে কি কান্না! কান্না আর কান্না। ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিয়েছে। কপালে হাত ঠেকিয়ে ইশারায়

বলে দিয়েছে ধরে রাখতে পারে নি, কিছু করতে পারল না পুষ্পকলি। তার সব ক্ষমতার বাইরে।

গেটের বাইরে গিয়ে সুলভ মুখ তুলেছে ওপরে। মাকে দেখার চেষ্টা। না, বারান্দায় নেই মা।

একটা বুক মোচড়ানো ব্যথার নিঃশ্বাস গেটের বাইরের বাতাস মিশে গেছে।

গেটের ধারে বসে আছে রহলা।

দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে বিড়বিড় করে বলে চলেছে—

জিদের বশে কি করলিরে মোর মন,
রামচন্দেরে পাঠালি তুই বন

সুরশ্রুতির বিয়ের পর থেকেই বর্ণমালা এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে নি। সদাই আতঙ্ক। 'কি খবর আসে, কি খবর আসে', মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ছায়া ভেসে উঠেছে বর্ণমালার চোখে বারবার। আগের ব্যাপারটা আবার না ঘটে।

মনকে বুঝিয়েছে 'না-না'। তা কেন হবে! তার ভাবনা চিন্তা ভুলই হয়ে যায় যেন।

ভুল হলো কই? হলো না হলো না।

সুরশ্রুতি আর সুলভ এসে হাজির। বর্ণমালার কাছে।

বর্ণমালার জন্যে কি এনেছে ওরা?

কেন—অঝোরে ঝরা চোখের জল দুজনের।

ওদের দেখে আশ্চর্য হয় নি বর্ণমালা। এটা হবে জানাই তো ছিল।

সুরশ্রুতির প্রথম বিয়েতেও শ্বশুর ঘর হয় নি। মেয়েকে জড়পদার্থ পাগল বলে বাড়িতে এসে তুলে দিয়ে গেছে। মেয়ের জন্যে বর্ণমালকে কম কথা শুনিয়ে যায়নি। যৎপরোনাস্তি। গালমন্দ অপমান। শুধু গায়ে হাত দিতে বাকি রেখেছে। তাও তেড়ে এসেছিল।

এখানে একটু তফাৎ এই যা, সুলভ ত্যাগ করেনি সুরকে। সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। কথা দিয়েছিল, কথা রেখেছে। বিয়ের আগে বর্ণমালা যখন মেয়ের জীবনকথা শুনিয়েছে সুলভকে, বলেছে, তুমি আবার এইভাবে ত্যাগ করবে না তো?

না, বাড়িতে সেরকম কিছু ঘটলে, বাড়ি ত্যাগ করব। সুরকে না কক্ষনো না।

দুজনে এসে প্রণাম করেছে বর্ণমালাকে।

বর্ণমালা সুলভের চিবুক ধরে আদর করে বলেছে ম্লান হাসি মুখে টেনে।—

সোনার চাঁদ ছেলে আমার! শান্তি পাও বাবা!

মেয়েকে কোনো কথা নয়।

মেয়ে তো মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে বর্ণমালা।

বর্ণমালার ভাগ্য দোষেই আজ সুরের এই অবস্থা।

মা চায় নি তারই জীবন ঘুরে ফিরে আসুক মেয়ের জীবনে।

বর্ণমালা সুকণ্ঠী সুগায়িকা। গান শুনেই, গানকে ভালোবেসেই তাকে বিয়ে করেছে সুরের বাবা।

ঘর বাঁধা হলো কই!

শ্বশুরবাড়ির চাহিদা গানের অনুষ্ঠানে বৌ যা কামাবে তাদের প্রাপ্য। বৌ এখন বাপের বাড়ির নয়। শ্বশুরবাড়ির কেনা হয়ে গেছে।

এ মত মেনে নিতে পারেনি বর্ণমালা।

তার মা নেই। ছোটবেলা থেকে দিদিমার কাছে মানুষ। তার টাকা দিদিমারই প্রাপ্য। সে ছাড়া দিদিমার আর কোনো অবলম্বন নেই।

শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দিদিমার কাছেই ফিরে এসেছে বর্ণমালা। তার আয়ের ওপর হিসাবনিকাশ করেই বিয়েটা হয়েছিল তা হলে। অমন বাড়িতে জীবনে যাবে না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এলেও স্বামী তাকে ত্যাগ করে নি। স্বামী আসা যাওয়া করেছে নিয়মিত। শ্বশুরবাড়ির সেটা সহ্য হয় নি। সুরের বাবাকে, বলতে গেলে জোর করেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

সুরকে নিয়েই বর্ণমালার বেঁচে থাকা। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে, ওকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।

বছরখানেক হলো সুলভরা এসেছে বর্ণমালার কাছে। সুলভ কিন্তু আগের মতন নেই। কেমন একটা আনমনা আনমনা ভাব। নিজের মনের শান্তি আনবার জন্যে এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়িয়েছে সুরকে নিয়ে নিয়ে। শান্তি আসা তো দূরের কথা, মুখের হাসি মিলিয়েছে। ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ডাকলে সাড়া নেই—কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ফ্যালফ্যাল চেয়ে দেখে চিনতে অনেক দেরি হয়। এটা বেশি করে ধরা পড়ছে ওদের সিকিম থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে।

দেশে দেশে ঘোরার আগে সুরশ্রুতি সুলভকে অনেক বুঝিয়েছে।

সুলভ কিছু মনে কোর না—আমি তোমার চিরদিনের। চিরদিনই তোমার হয়ে থাকব। তুমিও আমার। তবু একটা কথা বলি, আমার নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হয়। একটি স্নেহ মমতাময়ী মায়ের বুক থেকে তার অতি আদরের অতি স্নেহের ছেলেকে কেড়ে নেয়ার অপরাধে।

সুলভ সুরশ্রুতির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছে, এ কথা আর দ্বিতীয়বার ব'লো

না। শুনলে আমার কষ্ট হয়। কোনো অপরাধ তুমি করো নি। কোনো বিষয়ে তুমি কারো কাছেই অপরাধী নও।

একটু থেমে বলেছে, তুই আমাকে ফিরে যাওয়ার কথা বলছ তো? ফেরা আর আমার হয় না সুর। সকলেই ত্যাগ করেছে। করুক, কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু মা!

অস্থির হয়ে পড়েছে সুলভ। দুহাতে নিজের বুক চেপে ধরেছে নিজেই।—বড় কষ্ট সুর, বড় কষ্ট।

সুরশ্রুতি মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বলেছে, কেউ তোমায় ছাড়ে নি। তুমি ভুল বুঝো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখ না, তোমাকে ডাকতে এল বুঝি।

মৃদুস্বরে বলেছে সুলভ, না-না। কেউ ডাকবে না। ভুলেও না। আমিই ভুলতে চাইছি সকলকে। পারছি না, পারছি না। পারছি না।

মানুষটা খুবই স্পর্শকাতর। সুলভের ব্যথা-বেদনা শুধু এই কারণেই। মুখে যাই বলুক না কেন, ওর অন্তর মাথা কুটে কুটে কেঁদে মরছে দিনরাত।

সুরশ্রুতির কাছে এটা অজানা নয়।

শোয়ার ঘর।

ছিমছাম ঘরে ছিমছাম সাজানো। সাজানোটা সুরশ্রুতির নয়। বর্ণমালার। সাজাতে গোছাতে বর্ণমালা ভালোবাসে। নিজেও সাজত। সুর তো সাজতে জানে না, সুরকে মা-ই সাজিয়ে দেয়।

সেদিন সুরশ্রুতিকে বর্ণমালা সাজিয়ে দিয়েছে।

নীল শাড়ি নীল ব্লাউজ। ডান হাতের কড়ে আঙুলে স্রেফ একটা কমল হিরের আংটি আর গলায় সরু চেন।

শোয়ার ঘরখানা নীল ভেলভেটের কার্পেটে মোড়া। একটা ছোট্ট নীল আলো জ্বলছে। ঘরের দু'মোড়ে—দক্ষিণ আর উত্তরে দু'খানা খাট পাতা।

দক্ষিণে সুরশ্রুতি আর উত্তরে সুলভের।

গভীর রাত্তির।

ঢঙ ঢঙ। রাত দুটো।

কেন জানিনা সুরশ্রুতির চোখের পাতায় ঘুম নামছে না। বিছানায় ছটফট করছে। ঘরের মধ্যে একটা আওয়াজ ঘুরে বেরাচ্ছে। কে যেন কি বলছে!

ভালো ক'রে কান পেতে শুনেছে সুরশ্রুতি। আওয়াজটা সুলভের কাছ থেকেই আসছে মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে—আওয়াজটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ঘুমের ঘোরে সুলভই বলে চলেছে।—মা মা মা...।

আস্তে আস্তে মাথার কাছে বসেছে সুরশ্রুতি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ঘুমোতে ঘুমোতেই সুরশ্রুতির হাতটা ধরেছে সুলভ।—তুমি এসেছ মা!

যে কোনো উপায়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুলভকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবেই। মায়ের বুকের জিনিসকে বুকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

না হোলে অসুস্থ হয়ে পড়বে সুলভ।

ও খুব চাপা ছেলে। মুখে কিছু বলে না। সব কিছুই মন-মন। ঘুমন্ত অবস্থায় আসল মনোভাবটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখানে এবাড়িতে ওর দেহ আছে বটে। মন ও বাড়িতে। যাওয়া-আসা ডাকাডাকি—এসব-মান অভিমানেরই পালা।

ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখে অবাক সুলভ।

তুমি! আমি কোথায়!

তুমি তোমার বাড়িতে। ফিরে যাবে?

না। উঠে বসেছে সুলভ।

আমার জন্যে বাড়িঘর মা বাপ দিদি আর সুখন শোভনকে ত্যাগ করা উচিত হবে না।

তুমি তো সব জানো সুর। ত্যাগ কারা করেছে। সুর, ও সব কথা তুলো না আর। আমি ভুলে থাকতে চাই।

ভুলে থাকতে গিয়ে দেশে দেশে ঘুরেছে অনেক। দেখা যাচ্ছে সুলভ ভোলার চিন্তা এত করেছে যে, ও নিজেকেও ভুলতে বসেছে।

সুরশ্রুতির ভালো লাগছে না।

একটা অশুভ ইশারার হাতছানি দেখতে পাচ্ছে। কি করবে, ওকে নিয়ে কোথায় যাবে, কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। কি করে কেমন করে ওকে স্বাভাবিক করা যায়। সুস্থ মনের মানুষ হয়ে উঠুক ও।

হলো কই, হচ্ছে কই!

সুলভের মন সরাবার জন্যে সিকিমে এসেছে।

সিকিমের পাহাড়ে উঠে আর এক বিপদ। মানুষটা অন্য মানুষটা হয়ে গেছে। লামাদের দেখে এত মুগ্ধ যে, ও বুঝি ওদেরই একজন।

কাঠের সুন্দর বার্নিশ করা মন্দির। সোনার চুড়ো। দেখে দেখেও ওর সাধ মেটে নি। একই জিনিস দেখেছে একবার না দু'বার নয়—বারবার।

ভেতরে সব বয়েসেরই ছেলেরা রয়েছে। ন্যাড়া মাথা, পরনে লাল সিল্ক। সুন্দর সৌম্য মূর্তি। এরাও এক একটা বুদ্ধ। ছোটবড় সোনার বুদ্ধ মূর্তি সাজানো। ঝকঝকে তকতকে।

দুনিয়ার দুর্বৃত্তদের ছোঁয়া লাগেনি। এখনও জগতে থেকেও এ জগতের বাইরে এ গুম্ফা বৌদ্ধ মঠ। এই মর্তে এ এক স্বর্গরাজ্য। ভেতরে পর পর সাজানো অনেক তামার বাসন জলে টইটম্বুর। সুলভ দেখা মাত্রই শুয়ে পড়ে প্রণাম করেছে। কেন করল কি ভেবে করল—জানা গেল না।

সঙ্গে সঙ্গে একজন লামা এসে আশীর্বাদ করেছে সুলভকে। ওই পবিত্র অমৃত জল খাইয়ে দিয়েছে। আগেকার যিনি প্রধান ছিলেন তাঁর দেহপ্রমাণ ছবি রয়েছে। মাথায় নানা রঙের পাথর বসানো মুকুট। পাশে একটি বছর দুয়েকের ছেলের ছবি।

এই ছেলের বারো বছর বয়স হলে, এই মঠে চলে আসবে। এই মঠের প্রধান হবে। রেনকোজি।

বড় ছবি রেনকোজির। ঘোষণা করে গেছেন মৃত্যুর আগে। তাঁর জায়গায় লোক এসে গেছে। জন্ম নিয়েছে। ছবির রেন্‌কোজির এবার যাবার সময়। তিনি আর থাকবেন না।

ভবিষ্যৎবাণীর পরই মোটর দুর্ঘটনায় তাঁর কথা ফলে গেছে। গাড়ির অন্যেরা সকলেই সুস্থ অক্ষত।

এইসব শোনার পর সুলভের মাথার মধ্যে খালি ঘুরে বেরিয়েছে একই চিন্তার ধারা।

দেহটা কিছু নয়। দেহ যাবে আবার নতুন দেহ। একই আত্মার ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া।

চিন্তা চিন্তা চিন্তা।

সুরশ্রুতিকে প্রায় বলেছে সুলভ, দেহ গেলে কারোর কিছু ভাববার নেই। ওটা এমন কিছু নয়। আসল মানুষটাই তো থাকছে চিরকাল। ধর, আমারও দেহ রইল না। তোমার দুঃখ কার উচিত হবে না একদম।

একি অলুক্ষণে কথা! কেঁদে সারা হয়েছে সুরশ্রুতি।

স্বপ্নের মানুষ সুলভ। স্বপ্নের রাজকুমার। স্বপ্নে মাখা মন।

বৈশাখের দুপুর কিন্তু শেষ রাতের ভোর নয়। রাস্তার দুপাশে সবুজ আর সবুজ, গাছের সারি। ভোরের হাওয়া মিষ্টি ঘুম পাড়ানো।

গাড়িতে বেড়াতে বেড়াতে সুরশ্রুতি সুলভকে বলেছে নতুন লোক দিল্লিতে এই সময়ে বেড়াতে এনে, আবহাওয়ার সম্বন্ধে কি ধারণা করবে?

সুন্দর।

দুপুর এলে মমে মর্মে টের পাবে। এখানকার ভোর দুপুর নয়। দুপুরের দাবদাহ আগুন।

লোকে বলে সকালের সূর্যোদয় দেখলে বোঝা যায় সারাদিন কি রকম যাবে।

একথা সবজায়গায় খাটে না। বিশেষ করে এখানে।

জোরে হেসে উঠেছে সুলভ। তোমার কি এখনও আবহাওয়াটা গা সওয়া হয়নি! তিন চার পুরুষ তো হ'য়ে গেল এখানে।

দেখ সুলভ তুমি গরমে শীতের কবিতা লেখ। গরমেও তোমার শীত অনুভব হতে পারে। এসব ভাবের ব্যাপার। তোমরা এখানে পুরনো হলেও, তুমি স্বতন্ত্র। তোমার বাড়ির কি সকলে তোমার মতো? আড় চোখে সুলভের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছে সুরশ্রুতি।

কবির কবিতা আবৃত্তির মতো নিজের লেখা কবিতা পাঠ করতে শুরু করে দিয়েছে সুলভ। ওর মন ভালো থাকলে এমনই করে থাকে।

কিঁউ পুছ মুঝে
ম্যায় ক্যা হুঁ।
সাচ কহে—
ম্যায় নেহি জানু।
বচ্‌পনমে 'বাচ্চা-বাচ্চা শুন্‌ শুন্‌কর
ম্যায় ওহি মানু।
জওয়ানি মে 'জওয়ান জওয়ান'
শুন্‌ শুন্‌কর ওহি বনু
বুঢ়্‌ঢে বুঢ়্‌ঢে সবকই বোলে
শুন শুন্‌কর মানলুঁ
আগে পিছে ক্যা হোগা ম্যায়
ক্যা থা ম্যায় নেহি জানু।
জানলে ওয়ালে সব্‌কুছ জানে
জো কহে ও ওহি মানু।

হো-হো করে হেসে উঠেছে সুরশ্রুতি।

এটা কি কবিতা হলো নাকি?

না। কবিতা নয় গান। কবিতার মতো করে পড়ছি। সহজ সরল উত্তর।

আমি লিখেছি তুমি গাইবে বলে।

সুলভের হাত থেকে লেখাটা নিয়ে পড়ত পড়তে গুনগুন করে গেয়েছে সুরশ্রুতি।

সুলভ! ভৈরবীতে এটা খুব খাপ খেয়ে গেছে। তুমি বড্ড দার্শনিক হয়ে পড়েছ।

মানেটা তো অদ্ভুত ধরনের। এর মানে ভাবলে তো মুশকিল। যোগী মুনি ঋষিদেরই কথা। আমাদের মতে সাধারণ সংসারী মানুষদের এটা কি ভাবা সম্ভব? তা হোলে তো একটা জড়পিণ্ড, নিস্পৃহ হয়ে যেতে হয়।

তুমি যাই বলো না কেন সুর, লেখাটা কি সত্যি নয়? আমরা কে কোথা থেকে এসেছি কেন এসেছি। ছোটবেলায় জেনেছি আমি বাচ্চা। যৌবনে যুবক। বৃদ্ধ বয়েসে বুড়ো। এরপর? আগে ছিলুম কি পরেই বা হব কি, সঠিক কি কেউ বলতে পারে?

না, পারে না। সুরশ্রুতির স্পষ্ট জবাব।

পারে। কেবল একজনই পারে। সে সব কিছু জানে। আগে কি ছিলুম পরে কি হব।

কে কে? সুলভ সে কে!

জানি না। জানা যায় না। শুধু জানবার চেষ্টা। চেষ্টা আর চেষ্টা।

বুক চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছে সুলভের। সুলভ আবার আনমনা। আগের হাসিখুশি মানুষটা আবার হারিয়ে গেল। সুরশ্রুতির অন্তহীন দুশ্চিন্তা।

মানুষটা কি আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না আর!

সুলভকে নিয়ে কত ঘোরাঘুরি। অন্যমনস্ক রাখবার পণ্ডশ্রম হয়ে যাচ্ছে কেবল।

ঠাকুর দেবতা সাধুসন্ত সকলের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ক'রে মাথা খুঁড়ে কিছুই হচ্ছে না। হবার নয় বুঝি।

দিন দিন সবকিছুই ভুলতে বসেছে সুলভ। কোনো কিছুতেই 'ভোলা' ব্যামোটা রোধ করতে পারা যাচ্ছে না। ডাক্তার কবিরাজরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। করবার কিছু নেই। হাতের বাইরে। আতিরিক্ত আঘাত থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছেটাই ওর স্মৃতিবিভ্রমের কারণ। ব্যথা ভুলতে গিয়ে সবই ভুলতে বসেছে ও নিজেকেও।

সুরশ্রুতি নিজে গেছে ও বাড়িতে।

ঢুকতে পারেনি। দোতলার থেকে খবর এসেছে। সুলভ স্বেচ্ছায় চলে গেছে। তাকে কেউ যেতে বলেনি। ওর ভোগান্তির ভার এ বাড়ির কেউ নেবেনা। কেউ দায়ীও নয়। কর্মফলের ভোগ তো ভুগতেই হবে।

ফিরে এসে সুরশ্রুতি মাকে জানায় নি। সুলভকেও না। শুনলে যেটুকু এখনও হুঁশ আসছে মাঝে মাঝে, সেটুকুও শেষ হয়ে যেতে পারে নিমেষে।

ক্রমে সুলভের এমন অবস্থা দাঁড়াতে লাগল যে, ওঠাবসা দাঁড়ান চলাফেরা—সব বন্ধ হয়ে গেল। দিনরাত শোয়া। চেয়ে থাকে, দেখে না। মনে হয় কিছু শুনতে পায় না। কোনো কথায় সায় নেই। খেতেও চায় না। মুখের আওয়াজ হারিয়ে গেছে। একরকম জোর করেই খাওয়ান। তাও কমতে শুরু করেছে।

বর্ণমালা ও বাড়িতে খবর দিয়েছে। ও বাড়ির বামুন ঠাকুর মারফত খবর এসেছে।

ছোট বেলায় ছোটদের ভাগ্য মা বাবা। বড় হলে অপরের হাতে তুলে দিলে দায়িত্ব আর থাকেনা। দায়িত্ব অন্যের ওপর বর্তায়। বৌয়ের এয়োত্তির জোরে এখন ছেলের পরমায়ু। মরণবাঁচন ও বাড়ির কারোর কোনো হাত নেই।

বলার কিছু নেই বর্ণমালার। বাদ-প্রতিবাদেরও কিছু নেই মা-মেয়ের। শুধু নীরবে সুলভের মাথার কাছে বসে বসে কাঁদা ছাড়া।

আপনজন আর জানাশোনারা—ও বাড়ির বর্ণমালাদের—সুলভকে দেখতে আসে।

কত স্বান্ত্বনা কত ভরসা দিয়ে যায় মানুষ।—সুরশ্রুতির এমন সেবার ফল নিশ্চয় ফলবে। নাওয়া খাওয়া ত্যাগ ক'রে দিনরাত জেগে বসে আছে সুলভের কাছে। সাক্ষাৎ সাবিত্রী। সাক্ষাৎ বেহুলা। ওর সত্যবান ওর লখীন্দর সুলভ। নিশ্চয় বেঁচে উঠবে, নিশ্চয় বাঁচবে। ঈশ্বর দয়া করবেনেই করবেন।

বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বলছে সুরশ্রুতি আশীর্বাদ করুন আপনারা সবাই।

কই, সুলভ ভালো হয়ে উঠল কই!

ধীরে ধীরে ঘুমের ঘোরে কখন সুলভ পালিয়ে গেছে কেউ জানতে পারে নি।

আশীর্বাদ প্রার্থনা—সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল।

সুলভ চলে যাওয়ার পর থেকে সুরশ্রুতি সারাক্ষণই অন্যমনস্ক। কি ভাবে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েকে নিয়ে, মহা ফাঁপরে পড়েছে বর্ণমালা। মেয়ের মুখের হাসি মিলিয়েছে। গলার সুর হারিয়েছে। সুলভের মতো স্মৃতিভ্রম রোগের শিকার হয়ে যাচ্ছে নাকি!

বর্ণমালার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত গেছে। ভেসে যায় নি ভেঙে পড়েনি।

সুরকে নিয়ে এবারে আর নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা ফিরে পাচ্ছে না একদম। মেয়েটার জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ওকে শান্তি দেয়ার কথাই ওঠে না। এখন

বাঁচানো দায় হয়ে গেছে। কি করবে কোথায় যাবে! কার কাছে যাবে!

অন্ধকারের অতলতলে ঢুকে যাবে বুঝি মা-মেয়ে।

এমন অবস্থায় মধ্যে কেউ আসে নি কেউ আসছেনা। কেউ আসবে না। শক্ত হতে হবেই হবে।

অনেকের পরামর্শ—বাইরে বাইরে ঘোরালে সুরশ্রুতির মনটন ঘুরতে পারে। ওর বুকে পাথর চাপা দুঃখ। সব হারানোর ব্যথা জমাট বেঁধে আছে। ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট কাঁদতে কষ্ট বলতে কষ্ট। কাঁদাতে হবে বলাতে হবে।

চেষ্টা ক'রে চলেছে বর্ণমালা। চেষ্টার কোনো খামতি কোনো ত্রুটি নেই।

মেয়েকে নিয়ে এদেশ-ওদেশ ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা স্বাভাবিক করতে পেরেছে। তবে মেয়ের ঝোঁক সুলভকে দেখবার। প্রবল ইচ্ছে। মন থেকে এটা কিছুতেই যাচ্ছে না। বর্ণমালা সরাতে পারছেনা। ক্লান্ত অবসন্ন।

দেখা যাচ্ছে সুরশ্রুতির একটা দিকে ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠছে, আত্মার আসা যাওয়া কখনও স্বচক্ষে দেখতে পাবে না? না পেলে বুঝতেও কি পারবে না যে, তার মধ্যেই রয়ে গেছে সুলভ। কেননা, একদিন হাসিতামাশা করতে করতে সুলভ একটা গান গেয়ে শুনিয়েছে, উদ্দেশ্য সুরশ্রুতি।

আমি রব তোমারই কথায় কথা কয়ে
তোমারই ব্যথায় ব্যথা বয়ে...

সুরশ্রুতি গানে উত্তর দিয়েছে।

তুমি যদি থাকো কাছে
খুঁজব না আর আগে পাছে।
বলে দিও বুঝিয়ে দিও মোরে
তুমি আছো আমি তাই
আমি আছি তুমি তাই
মোর স্বপন ধ্যানে।

সুরশ্রুতির একটু পরিবর্তন লক্ষ করছে বর্ণমালা।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। ও কাঁদে। সুলভের চিন্তা ক'রে তার লেখা গান গায়। যাক, সুলভকে নিয়েই আছে। একটা কিছু নিয়ে ওকে থাকতেই হবে। নাহলে ও বাঁচবে কি করে! জ্যান্তে মরে যাওয়ার চেয়ে মরে জ্যান্ত থাকা তবু ভালো।

সুলভের চলে যাওয়ার সঙ্গে সুরশ্রুতিও চলে গেছে একটা ভালো রকম জানে

বর্ণমালা। ভয় ছিল স্মৃতিভ্রম না হয়ে যায়। পাগল না হয়ে যায়। তার চেয়ে মৃত্যু হলেও খুশী হতে বর্ণমালা। মরণ হ'য়ে গেছে একরকম। ও মরে গিয়ে যেটুকু জ্যান্ত আছে যেন থাকে।

মেয়েটাকে নিয়ে কি করবে মহাভাবনা বর্ণমালার। লোকে শুনলে, তাকে রাক্ষুসি-ডাইনি আখ্যা দেবে সে বেঁচে থাকতে থাকতে। ও চলে গেলে বর্ণমালার শান্তি। কথাটা খুবই রূঢ়। কিন্তু বাস্তব সত্যি। অবাস্তব মানুষদের বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত দিনরাত। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অবাস্তব। স্বপ্ন-কল্পনার কোনো স্থান নেই। কোনো অধিকার নেই এই বাস্তবে বেঁচে থাকবার।

সুলভ ছিল স্বপ্ন সুরশ্রুতি কল্পনা।

এদের দেখবে কে?

কেউ দেখবার নেই। কেউ নেই কেউ নেই।

ভগবান দেখবে না?

এ কথার মানেই হয় না।

আছে কি না আছে, কে জানে!

শূন্যের ওপর ভরসা করা চলে না।

বর্ণমালার নিজেকে নিজেই অনেক প্রশ্ন করেছে। নিজের কাছ থেকেই অনেক উত্তর চেয়েছে। সব উত্তর যে মনঃপূত হয়েছে তা নয়। এখন সুরশ্রুতির আত্মায় আত্মবিশ্বাস বেড়ে উঠেছে। বাড়ুক। অন্তত এই নিয়ে থাকুক।

হরভজন সিংয়ের কথা শুনে মেয়ে তো এখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত। হরভজন সিংয়ের ধ্যান সর্বক্ষণ। হরভজন সিং নাকি সকলকে বিপদে রক্ষে করে। হরভজন সিং সুলভকে তার কাছে নিয়ে আসতে পারে।

তিব্বত-সিকিমের সীমানার শিখ সেপাই হরভজন সিং। উনিশশো আটষট্টির চৌঠা অক্টোবরের তুষার ঝড়ে হরভজন সিং হারিয়ে যায়। পরে বন্ধুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সমাধি তৈরি করতে বলে। যে জায়গায় হারিয়ে গেছে উড়কক্ আর তুকালার মাঝখানে সমাধি তৈরি হয়। সেপাই মহলের, অফিসার মহলের ধারণা নভেম্বরের তুষার ঝড়ে এখনও সীমানায় পাহারা দেয় হরভজন সিং সকলকে বাঁচাবার জন্য।

মেনলাতে হরভজন সিংয়ের মন্দির আছে। সেখানে সে বাবা। সকলের আশা ভরসা। সকলের এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। মৃত্যুর হাতছানি থেকে নিষ্কৃতি পাবার মুক্তি পাবার শক্তি।

সুরশ্রুতি রাতের শেষ প্রহরে মাঝে মাঝে সুলভের গান গায়।

মনে হয় কে যেন কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। বড্ড দেখবার ইচ্ছে। দেখতে না পেয়ে

ভীষণ কষ্ট। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। ঠাণ্ডা হাওয়া নেওয়ার জন্যে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দেখে, কে যেন আসছে। হরভজন সিং কি? না সুলভ! বুকের ভেতরটা পিষে যাচ্ছে। অসহ্য কষ্ট। সুলভকে আসতে কি কষ্টই না দিচ্ছে সুরশ্রুতি। চাপাকান্না বুক ঠেলে গলা ঠেলে বেরিয়ে আসে।

প্রায়ই হয় এটা। সারিস্‌কার প্রাসাদাপুরীতেও হয়েছে সেদিন।

কান্না শুনে এসেছে বৈভব সিং সমীরণবাঈ উদাসীমা। আরো অনেকে। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বৈভব সিংয়ের সঙ্গে।

বৈভব সিংকে প্রথম দেখে অপলকে চেয়ে থেকেছে সুরশ্রুতি। বৈভব সিংও সুরশ্রুতিকে দেখে।

দিনের আলোর মতো স্পষ্ট মনে পড়েছে সুরশ্রুতির। বৈভব সিংকে নতুন দেখছে না সে। এ সেই মানুষ। লোহার মিনারের কাছে যাকে দেখেছে উদাসীমা সেই সন্ন্যাসিনী—। যে বৈভব সিংকে বোঝাচ্ছে।

বৈভব সিংকে নিয়ে কি ধুন্ধুমার কি তুলকালাম কাণ্ড। কত অপযশ কত অপবাদ কলঙ্কে মাখামাখি সারা শরীর। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ।

এ-সেই বৈভব সিং!

সারিস্‌কার রাজপ্রাসাদে অতিথি নিবাসে দেখা হতেই চিনেছে সুরশ্রুতি।

বৈভব সিংও অগেকার মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে।

লোকের সন্দেহ হবারই কথা। সন্দেহ—বৈভব সিং-এর স্ত্রী সুমীরণবাঈ-এর মনে। সন্দেহ—উদাসী বর্ণমালার অবাক লেগেছে। এরকম চাওয়াচায়ি একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। যাক, সুরশ্রুতি আরতি করাতে দৈব-আশীর্বাদের মতো এ ভাবটা সরে গেছে তক্ষুণি।

সরে গেলেও উদাসীমায়ের থেকে এ দৃশ্য সরেনি। দ্বিগুণ কেন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে আরো। ব্যাপারটা কেমন কেমন। রহস্যের মোড়কে মোড়া যেন। মোড়ক ছিঁড়ে দেখতে হবে জানতে হবে। ছাড়লে চলবে না।

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠার মাঝেই একদিন সুরশ্রুতিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেছে পাশের ঘরে। আদর করে, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে—হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছে।—সুর! তোর সঙ্গে কি বৈভবের আগে থাকতে খুব জানাশোনা ছিল?

না। শুধু একবারের জন্যে দেখা। আর এই এখানে দ্বিতীয়বার।

ওকে কিরকম লেগেছে? নিশ্চয় ভালো? বল না আমার কাছে। লজ্জা করিসনা।

খুবই ভালো। সে ভালো কেমন মুখে বলা যায়না! একটা আলোর সরল শিশু। ঐ বুঝি জগতের সব অন্ধকারের ওপরে দাঁড়িয়ে। আলোয় আলো। দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয়েছে, ও আর আমি তফাৎ নই। অভিন্ন। আমি-ও, আর ও-ই আমি।

বুকভরা আনন্দ নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে উদাসীমা সুরশ্রুতিকে। মুখে বলেছে, এমন যে কারো হয়েছে জীবনে শুনিনি। এ যে দেবতা দর্শন।

সুরশ্রুতির বিয়ের আগে এই ধরনের প্রশ্নের সামনা সামনি হতে হয়েছে আরো একবার।

বর্ণমালার মুখে শোনার পর সুলভের প্রশ্নের জবাবে।

ভালো লেগেছিল যখন, তুমি ছেলেটিকে বিয়ে করনি কেন?

না-না-না। স্বামী হিসেবে ভালো লাগা নয়। ও শিশু, ভালো লাগার বস্তু।

সুলভ দ্বিতীয়বার আর কোনো প্রশ্ন করেনি সুরশ্রুতিকে। শুধু বলেছে, ঠিক আছে।

শ্বশুরবাড়িতে যখন একটি যুবকের ছবি আঁকা নিয়ে সুলভের কান ভাঙিয়েছে রহলার সঙ্গে অন্যজনেও, এখনও সুলভ কিছু গ্রাহ্য করেনি। কানে কোনো কথা নেয়নি। কোনো খারাপ ব্যবহারও করেনি। ও যেমন তেমনই থেকেছে। এই নিয়ে বেচারাকে কম শুনতে হয় নি।

প্রসাদপুরীতে বসে বসে সব জেনেছে উদাসীমা। সব শুনেছে—সুরশ্রুতির জীবনের করুণ কাহিনী। নিজের ধারণা-বিশ্বাস ঠিক করে নেয়ার জন্যে বৈভবকে আড়ালে ডেকেছে।

কথায় কথায় বৈভবেরও মনোভাব জেনে নিতে ছাড়েনি উদাসীমা।

প্রায় সুরশ্রুতির মতোই বৈভব সিংয়েরও ওই ধরনের বক্তব্য।

ও আলোর ছেলে। এমন আকর্ষণ, চোখ আপনা হতেই টেনেছে। ফেরাতে ইচ্ছে করে না। ওকে মেয়ে মনে হয়নি। একটা নিষ্পাপ বাচ্চা ছেলে। দেখতে দেখতে আয়নার নিজেকে দেখার মতো ওর জায়গায় আমাকেই দেখেছি। ভুলে গেছি সব। ভুলে থাকতেও ভালো লেগেছে।

বৈভব সিংয়ের পা থেকে মাথা অবধি বারবার চোখ বুলিয়েছে উদাসীমা। কি দেখতে চেষ্টা করেছে কি ভাবতে চেষ্টা করেছে, বিধাতারও অগোচর বুঝি।

অতিথি নিবাস থেকে চলে যাবার সময় হয়েছে।

উদাসীমায়েরও ইচ্ছে একবার কুমায়ুঁ হয়ে ঘুরে যায়। বর্ণমালাদেরও নিয়ে যেতে চায়। কিছুতেই ছাড়বে না।...

এসেছে আলমোড়াতে।

আলমোড়া থেকে খানিক দূরে চিতই পাহাড়। পাহাড়ে দেবদারু বট আর রঙ-বেরঙের ফুলের মেলা।

গোলু দেবতার মন্দির। চতুর্দিকে ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছেয়ে গেছে। নানা রকম মানুষের নানারকমের মনস্কামনা পূর্ণের নিশানা।

আশ্বিনের সন্ধে। জাগরিয়া উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসব করতে, গোলু দেবতার পুজো করতে এসেছে অনেকে। যাদের ওপর গোলু দেবতার কৃপা হয়েছে।

মন্দিরের ভেতর সারা দেয়ালে সাদা টালি বসানো। বেদীর ওপর দেয়ালে আটকানো পাথরে খোদাই গোলু দেবতার মূর্তি সাদা পাথরে ভেসে উঠেছে। জীবন্ত। বীর যোদ্ধা। ঘোড়ার ওপরে হাতে তীর-ধনুক।

গোলু দেবতা কিন্তু পুরাণের নয়। প্রায় হাজার বছর আগের রাজকুমার। এখানকারই। ঝালরাই রাজার ছেলে।

মা কলিঙ্কা তপস্বিনী। রাজার অন্য সাত রানী। তারা হিংসের বশে গোলুকে জন্মাবার পরেই জলে ভাসিয়ে দেয়। ডানা জেলে জালে পায় নদী থেকেই।

বড় হয়ে গোলু এসেছে নিজের রাজ্যে ফিরে। নিজের প্রমাণ—পরিচয় দিয়েছে। রাজার আদেশে সাত রানী বন্দী।

গোলু সিংহাসনে বসার পর সৎমায়েদের মুক্তি দিয়েছে।

গোলুর এমনই ন্যায় বিচার যে, ন্যায়ের দেবতা হিসেবে সকলের মুখে মুখে প্রচারের হাওয়া বয়ে গেছে। আশেপাশের রাজ্যে কাউকে কোনো অন্যায় করতে দেয় নি গোলু। সব এক করে সকলকে সমান চোখে দেখেছে। সমান ভাবে সবার শাসন। সমান ভাবে সবাইকে ভালোবাসে।

এখনও গোলু দেবতার মন্দিরে প্রার্থনায় দেবতা নাকি সুবিচারই করে। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন।

যাদের ফল ফলে, তারা আসে। জাগরিয়া উৎসব পালন করে। মাঝরাত অবধি চলে।

ঢোলক বাজছে তামার থালা বাজছে। ডাংগরিয়া—পুরোহিত ধুনির আগুনের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলেছে।

আশ্চর্য হয়ে গেছে সকলে।

এরপর।

বেড়াতে বেড়াতে যে বাড়িতেই অতিথি হিসেবে গেছে উদাসীমায়েরা, সে বাড়িতেই যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন তুলনাহীন বললে চলে। এ আপ্যায়ন নতুন ধরনের। চোখে না পড়ে যায় না।

নতুন অতিথিদের আরতি।

বাড়ির মায়েরা আরতির থালা নিয়ে আরতি করে। আরতির থালা থেকে চন্দনের টিপ পরিয়ে দেয়। প্রদীপের মঙ্গলতাপ কপালে। অতিথি একটা না-জানা আনন্দে এত বিভোর হয়ে পরে যে, ভুলে যায়।

অতিথি আপ্যায়ন চলছে। চলছে আরতি।

উদাসী মায়ের লক্ষ শুধু সুরশ্রুতি।

সুরশ্রুতির দু'চোখ বুজে এসেছে। রাজ্যের ঘুম। পাশে দাঁড়ানো উদাসী মায়ের বুকের ওপরেই মাথা লুটিয়ে পড়েছে।

সকলে মিলে সুরশ্রুতিকে ধরাধরি ক'রে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়। ঘুম ঘুম ঘুম।

সুরশ্রুতির মুখের দিকে তাকিয়ে উদাসীমা। মাথার কাছে কাছে বসে। কি এত দেখছে?

কুমায়ুঁ ভ্রমণের পর নিজের দেশের বাড়ি দেখবার জন্য উদ্বাস্ত হয়ে উঠেছে।

বর্ণমালা আর বৈভব সিংদের ধরে নিয়ে এসেছে জিয়াগঞ্জে।

কোথায় বাড়ি!

খালি বাড়িভাঙা ইটের স্তূপ আর স্তূপ।

উদাসী মা কি পাগল নাকি! সবাই অবাক।

উদাসীমা সবার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বৈভব সিং আনমনা হয়ে উঠছে।

সুরশ্রুতির আবার ঘুমের ঘোর দুচোখে।

ধীরে ধীরে স্তূপের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আটকাতে চেষ্টা করেছে বর্ণমালা। হাতের আড়ালে উদাসীমা আটকেছে বর্ণমালাকে। নিজের মুখে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলেছে সকলকে। কোনো ভয় নেই।

সে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। অদ্ভুত পরিবেশ।

মেঘলা আকাশ। দিনের বেলায় সন্ধের ছায়া।

আকাশের দিকে দু'চোখ উদাসীমায়ের। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়েছে। বুকটা ওঠানামা জোরে জোরে।

এককালে সুখরানী এখানকার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল একদিন। পোড়ো বাড়ি, উপায় নেই তাই। এখানে তার বাবার ভিটে। বাড়িটার অবস্থা জরাজীর্ণ ভগ্নদশা।

শ্বশুরবাড়িতে ভাসুর-মায়ের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহারই হয়নি কোনদিন। শান্তির আবহাওয়া।

এই শান্তির আবাহাওয়াতে নির্মম-নির্দয় অশান্ত-অসুরের প্রবেশ। আর কেউ নয়। ভাসুরের নিজের বড় ছেলে।

কেন যে অমন হলো বোঝা গেল না। মা-বাবার তুলনা নেই।

ডাকাতের দলে পড়ে একেবারে পুরো ডাকাত।

সুখরানীর ঘরের আলমারিতে গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি থাকে। ছেলের জন্যেই সরালো। কি ভাবে জানতে পেরে মাঝরাতে হানা।

ওকে চিনে ফেলেছে কাকা। সুখরানীর স্বামী—

বুকের ওপর ভোজলি ধরে বলেছে, কোনদিন একথা যদি প্রকাশ হয়ে পারে, জানব তুমি। কোনো উপায় নেই তোমার প্রাণে বাঁচবার।

ভয় দেখানো সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি ও। পথের কাঁটাকে তুলে ফেলতে চেয়েছে। নিকেশ করে ফেলতে চেয়েছে প্রত্যক্ষ সাক্ষীকে।

নদীতে সাঁতার কাটার নাম করে নিয়ে গেছে কাকাকে।

ফিরে আসেনি আর সুখরানীর স্বামী কোনদিন। সুখরানী মনে মনে আঁচ করে নিয়েছে কি ঘটনা ঘটতে পারে। মুখবন্ধ। দুটো ছেলে রয়েছে যে তার—রূপ-অরূপ। দুজনে যমজ। সবে এগারোয় পা দিয়েছে।

ওদের দুজনকে বাঁচানোর দায়িত্ব একমাত্র সুখরানীরই। ডাকাতির রাতে ছেলে দুটোর ঘুম ভেঙে গেছে। ওরাও দেখেছে ওদের জ্যাঠতুতো দাদাকে। দাদার চোখে চোখ পড়তে ওরা ভয়েময়ে চোখ বুজে ফেলেছে।

সুখরানী বেশ বুঝতে পেরেছে যে ওদের জীবন বিপন্ন। যে কোনো মুহূর্তে।

রূপ-অরূপকে নিয়ে সোজা চলে এসেছে এই দেশের বাড়িতে। কারও কোনো বারণ শোনে নি। নিয়তি বুঝি নেপথ্যে বসে বসে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে তখন। বোঝবার ক্ষমতা ছিল না সুখরানীর।

কিছু দিন থাকার পর নেমেছে বর্ষা। দেশ-ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর কি। কি মেঘের গর্জন কি বিদ্যুৎ চমকানো। তার ওপর ঝড়ের প্রবল দাপট।

সেই অবস্থাতেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে সুখরানী। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে অরূপের। ডাক্তার ডেকে আনতে হবে, ওষুধ দিতে হবে।

ডাক্তারকে খবর দিয়ে দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে পাল্লা রেখে প্রাণপণে ছুটে আসছে সুখরানী। ওরা দুজনে একা ঘরে।

একি দেখছে সুখরানী! ভুল না ঠিক। ভূমিকম্প কি! বাড়িটা কাঁপছে না! মর্মছেঁড়া আর্তস্বর বেরিয়ে এসেছে সুখরানীর গলা থেকে।—রূ-প অ-রূ-প রূ-প অ-রূ-প...।

মা মা...। রূপের কণ্ঠে ভয়। হারানোর। নিজেকে—সকলকে।

বাড়িটা ভেঙে পড়ল চোখের সামনে। বেরোতে পারল না, বেরোতে পারলনা।

আচমকা উদাসীমা বুকফাটা কান্নায় বেঙে পড়েছে।—রূ-প—অ-রূ-প.. ।

সুরশ্রুতি চিৎকার ক'রে উঠে ব্যাকুল কান্নাভেজা গলা—মা...!

স্তূপের কাছ থেকে ছুটে এসেই জড়িয়ে ধরেছে উদাসীমাকে। পাশ থেকে বৈভব সিংও।

বুকের ওপর দুজনে। বাঁ দিকে সুরশ্রুতি, ডানদিকে বৈভব সিং।

দুহাতে দুজনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে উদাসীমা। প্রায় দু'যুগ আগের মা সুখরানীকে ফিরে পেয়েছে আবার নতুন ক'রে বুঝি ওরা। নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ঘুমন্ত শিশুর মুখের মতো দুজনের মুখে স্বর্গের আনন্দ মাখা।

উদাসীমা মুখ নিচু ক'রে দুজনকে বারবার দেখছে। আর কি যেন কি ভাবছে। সত্যিই ফিরে পেয়েছে কি তার হারানো নিধিদের! ঠিক রূপ-অরূপ, সেদিনের সেই এগারো বছরের যমজ শিশু দুটি।

নিশ্চয় সত্যি। সমস্ত সত্যি। উদাসীমা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে।

এলাহাবাদের প্রয়াগে মাঘ মেলায় প্রথম দেখা বৈভব সিং-এর সঙ্গে। সন্ন্যাসিনী ত্রিবেণীমায়ের তাঁবুতে। ওর 'মা'-ডাকের মধ্যে অরূপের শিশুকণ্ঠ শুনে চমকে

উঠেছে। পা থেকে মাথা অবধি নিখুঁত ভাবে দেখেছে। যুবক বৈভব সিংয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে বাচ্চা অরূপ। নিজেকে ভুলে গেছে উদাসীমা।

সুখরানী থেকে সে যে সন্ন্যাসিনী উদাসীমা এখন, সে-কথাটাও।

আগের সুখরানী হ'য়ে উঠেছে পুরোপুরি উদাসীমা। বুকে জাপটে ধরেছে বৈভব সিংকে—বাবা! তুই তো আমার অরূপ রে।

বৈভব সিংয়ের মুখ দিয়ে অগোচরেই বেরিয়ে এসেছে—হ্যাঁ মা। হ্যাঁ-হ্যাঁ।

এরপর থেকে যেখানে যেখানে যেতে চেয়েছে উদাসীমা, বৈভব সিং নিয়ে গেছে সেখানে সেখানে।

প্রতি বছরেই মাঘ মেলায় উদাসীমা বৈভব সিং দুজনেই গেছে ত্রিবেণী মায়ের কাছে।

ত্রিবেণীমা ছাড়া সুখরানী আজ উদাসীমা হতে পারত না। কোথায় ভেসে যেত, কোথায় হারিয়ে যেত তার ঠিক ঠিকানা নেই, পাওয়া যেত না কোনদিন।

রূপ-অরূপকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছে পাগলের মতো। কোথাও পায় নি। যখন-তখন লোকের বাড়ির দরজায় ঘা মেরেছি।

তোমাদের বাড়ি কি রূপ-অরূপ এসেছে?

বিফল হয়ে পথে পথে ঘুরেছে, নানা তীর্থক্ষেত্রে সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ধন্না দিয়েছে।

আমার রূপ-অরূপকে ফিরিয়ে দিন না আপনারা। এনে দিন না।

কেউ বলেছে, অসম্ভব কথা। এ পৃথিবীতে কি কেউ অমর হয়ে আছে আদৌ। সাধুসন্ত অবতার ভগবান—যারাই দেহ ধরে এসেছে, তাদেরই যেতে হয়েছে। জগতের ধর্ম-জন্ম আর গত-মরণ। প্রত্যেকেই এ মানতে হয়েছে।

কেউ আবার বলেছে শান্ত হও মা। ঈশ্বরের কৃপা হলে সব কিছু হয়। প্রাণভরে ডাকো।

কোনো জায়গাতেই সুখরানী এতটুকু শান্তি পায় নি। আশা পায় নি। ঘন অন্ধকারে আলোর একটা ছোট্ট বিন্দুও চোখে পড়েনি। খালি অন্ধকার আর অন্ধকার। অন্ধের মতো অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে।

একমাত্র ত্রিবেণীমা-ই নিরাশ করেন নি। আশা দিয়েছেন। বলেছেন, বেটি! একমনে এক বিশ্বাসে ঠিক থাকতে পারলে, সব কিছুই কাছে এসে যায়। তুমি ঠিক থাকো, নিশ্চয় পাবে। নিশ্চয় ফিরে পাবে একদিন না একদিন।

জীবদ্দশায় কি?

হ্যাঁ, বেটি।

একটা নিজেরই লেখা গান শুনিয়ে বলেছেন ত্রিবেণীমা, গানের প্রতিটি বাণী-শব্দ জানবে তোমাক একার নয়—সকলেরই জপমন্ত্র। গানের মানেটা জানবে ধ্যান। মনে প্রাণে চাওয়াকে ধরে রাখা। গুন গুন করে গেয়েছেন ত্রিবেণীমা মিষ্টি গলায়।

ত্রিবেণীমায়ের বয়সের গাছ-পাথর নেই, তবুও দেহে-গলায় কোনো ভাঙন ধরে নি। সুন্দর সুমিষ্ট।

এক ভাওনা মে ধ্যান লগারাখ
আশা পুরি হো জায়েগি
এক বিশওয়াস সে মত্ ডোল রে,—
মিলনা জো তেরি মিল জায়েগি।...

ত্রিবেণীমায়ের এই মন্ত্র এই ধ্যান একত্রিশ বছর থেকে আজ ছাপ্পান্ন বছর অবধি মেনে চলেছে উদাসীমা। এই নামটাও ত্রিবেণীমায়েরই দেয়া। সন্ন্যাস দেয়ার পর।

সারিস্কার প্রসাদপুরীর অতিথি বিনাসে সুরশ্রুতিকে দেখেও আশ্চর্য হয়ে গেছে উদাসীমা। বিশেষ করে নতুন মানুষকে আদর-আপ্যায়নের সময় আরতি করা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেও কোনো হদিস পায় নি। কে শিখিয়েছে, কোথা থেকে শিখেছে?

পেয়েছে কুমায়ুঁতে।

রূপের সাত আট বছর বয়েসের সময় সুখরানী রূপ-অরূপ আর ওদের বাবা—একসঙ্গে বেড়াতে এসেছে। ওখানকার নিয়ম অতিথিদের আরতি করা। লক্ষ করেছে, আরতি দেখতে দেখতে সুরশ্রুতি কেমন হয়ে গেছে। মাথাটা ঢলে পড়েছে উদাসীমায়ের বুকের ওপর। ঘুম। গভীর ঘুম। তখনই সুরশ্রুতির পরীক্ষা শেষ। রূপেরও একই অবস্থা হতো।

সুরশ্রুতির বৈভব সিংকে দেখার আর বৈভব সিংয়ের সুরশ্রুতিকে দেখাদেখির মধ্যে তেমন তফাৎ নেই। উদাসীমায়ের বৈভব সিংকে প্রথম দেখার অনেকটা মিল। স্বপ্নের মতো শিশু অবস্থায় দেখেছে বৈভবকে উদাসীমা আর সুরশ্রুতি। সুরশ্রুতিকে বৈভব।

নিয়ে এসেছে বাস্তুভিটেয়।

উদাসীমায়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে রূপ আর অরূপ সুরশ্রুতি আর বৈভব সিংই।

উদাসীমা তো পেয়েই গেছে। আর কেন এদের আঁকড়ে ধরে রাখা! দেখার স্বাদ পাওয়ার সাধ মিটে গেছে।

এখন আকাশে মেঘ নেই আর। পরিষ্কার নীল। অসময়ের সন্ধেটাও সরে গেছে। ঝরে পড়ছে সূর্যের সোনালী আলো।

উদাসীমায়ের কাছে মোটে এগারো বছর। কিন্তু—কিন্তু সুরশ্রুতির বর্তমান মা বর্ণমালার কাছে? দীর্ঘ চব্বিশ বছর।

সুমীরণবাঈ বৈভব সিংয়ের স্ত্রী হোলেও তার ভূমিকা মায়েরই মতন। সদাসর্বদা স্বামীর সঙ্গিনী। আগলে আগলে রেখেছে। পাছে স্বামী বিবাগী হয়ে যায়।

এদের বুক থেকে দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে না উদাসীমা কিছুতেই কোনো প্রকারেই। উচিত নয় উচিত নয়।

দুজনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহঝরা মৃদুস্বরে বলেছে উদাসীমা সুরশ্রুতিকে।

সুর! ফিরে যা বর্ণমালার কাছে—মায়ের কাছে।

বৈভব সিং, ফিরে যা সুমীরণবাঈ-এর কাছে। উদাসীমা ওদের ছেড়ে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে।

সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে।

এগিয়ে চলছে।

চলছে চলছে চলছে।

মধুর গলায় মধুর গান। ত্রিবেণীমায়ের গাওয়া। উদাসীমায়ের শেখা মন্ত্র-ধ্যান। এক ভাওনা মে...।

সকলের চোখ উদাসী মায়ের চলার পথে।

ফিরে তাকায়নি আর উদাসীমা। ধীরে ধীরে সবার চোখের বাইরে চলে গেছে চলে গেছে। চলে গেল।

ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। ভেসে আসছে বাতাসে গলার স্বর সুর কথা।

এক ভাওনা মে ধ্যান লগা রাখ
আশা পুরি হো জায়েগি...।
